রহস্যময় ভূতের গল্প

রহস্যময় ভূতের গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূর্য পাবলিশার্স
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
এন. গরাই
সূর্য পাবলিশার্স
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—৭৩

RAHASHYAMAYA BHUTER GALP
(Collected Stories for Children)
by
Sunill Gangapadhyay

Rupees Thirty Five Only.

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা
রজত জয়ন্তী বর্ষ, ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ সত্য চক্রবর্ত্তী
অলংকরণে ঃ সুবল সরকার

লেজার টাইপ সেটিং ঃ স্বপন কুমার জানা
মুদ্রাকর ঃ অসটার কমার্স (প্রাঃ) লিঃ
৪৭, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলি—৫৪

মূল্য ঃ ৩৫ টাকা

সূচীপত্র

	গল্প	পৃষ্ঠা
১.	ভূতপেত্নী	৫
২.	ছোটমামার ব্যাপারটা	১২
৩.	রাক্ষুসে পাথর	২৫
৪.	জ্যান্ত খেলনা	৩৬
৫.	পানিমুড়ার কবলে	৪৮
৬.	ক্ষতিপূরণ	৫৬
৭.	সেই অদ্ভুত লোকটা	৬৫
৮.	কেন দেখা দিল না	৭২
৯.	দূর্গের মত সেই বাড়ীটা	৭৯
১০.	একটি লাল লঙ্কা	৮৭
১১.	বেনী নস্করের মুন্ডু	১০৬
১২.	ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ	১২০
১৩.	অন্ধকারে গোলাপ বাগান	১৪২
১৪.	সাতজনের তিনজন	১৫৪
১৫.	দক্ষিণের ঘর	১৬৫
১৬.	নাগ চৌধুরীদের বাগান বাড়ী	১৬৮
১৭.	আলোর সিঁড়ি বেয়ে	১৮১

ভূতপেত্নী

বাসুদেবপুরের হরিহর বাঁড়ুজ্যে বা শ্রীযুক্ত হরিহর ব্যানার্জীর নাম প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেকটা লোকের মুখে একবারে অমৃতের মতন। আর হবে নাই বা কেন। হরিহর যদি না থাকতো তবে এই গ্রাম একদিন শ্মশান হয়ে ভূত-পেত্নীর গ্রাম হয়ে যেত। কত লোকের অসুখ বিসুখ হয়। আর হরিহর বাঁড়ুজ্যে তাদের সারিয়ে তোলে। কার কুষ্ঠ, কার কলেরা—দিনে, দুপুরে, রাত্রে যখনই ডাকে তখনই ছুটে যায় হরিহর। রুগী বা রুগীর বাড়ীর লোক প্রথমে তার ব্যবহারে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু পরে তারা হরিহরের ভেতরের আসল রূপটাকে ধরে ফেলে। এখন আর কেউই তেমন কিছু মনে করে না। ডাক্তারটা ছিল বড্ড গরীব। আর গরীব হবে নাই বা কেন? কখনও মুখ ফুটে একটা পয়সা চাইতো না, চাইলেই বা দেবে কোত্থেকে। গ্রামের নাম যদি দুঃখী গ্রাম হতো তো নামটা মন্দ হতো না।

পঁচিশ বছর ধরে ডাক্তারী করেছে হরিহর। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছে বড় হয়ে ডাক্তার হবে। ডাক্তার হয়ে সে মানুষের সেবা করবে। তাই আজ অবধি মানুষের সেবাই করে চলেছে।

গ্রামের লোকজন অবশ্য ডাক্তারী ফি বাবদ পয়সা কড়ি দিতে পারতো না।

কিন্তু দেবতার মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। গ্রামের কোন লোক তার মুখের উপর কথাটি পর্যন্ত বলতে বিশেষ সাহস পেতো না।

এই সেদিনের কথা। রাত তখন প্রায় একটা-দেড়টা হবে।

সনাতনের মা প্রায় যায় যায় অবস্থা, তিন মাস ধরে বুড়ি ভুগছে। যমদূত প্রায় ঘরের চৌকাঠে বসে আছে বললেও চলে। কিন্তু চৌকাঠের ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ঐ হরিহর ডাক্তার। কি যেন একটা বুকের ব্যামোয় ভুগছে ঐ বুড়ি।

বুড়িকে দেখে ডাক্তার সমস্ত ওষুধ-পত্র দিয়ে বেরোলো। রাত তখন প্রায় আড়াইটা। বুড়ি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

বাড়ীর বাইরে এসে সনাতন ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু ডাক্তার বারণ করতে সে আর এগোলো না। কারণ সে কেন গ্রামের কেউই হরিহরের মুখের উপর বিশেষ একটা কথা বলতে সাহস পায় না।

আসার সময় হরিহর সনাতনের সঙ্গে ডানদিকের পথ ধরে এসেছিল। অবশ্য একটু বেশী পথ হাঁটতে হয়েছিল কিন্তু বাঁদিকের পথ ধরে গেলে হরিহর ডাক্তারের বাড়ী খুব কাছে হয়।

কিন্তু লোকে বলে বাঁদিকের রাস্তাটা নাকি খুব বিপদজনক। ওদিকে সন্ধ্যের পর কোন মানুষ জন ওই পথ হাঁটে না। ওদিকে গেলে একটা পোড়ো বাড়ী পড়ে। দিনের বেলায় অবশ্য সেই বাড়ীতে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা খেলাধূলা করতে যায় কিন্তু সন্ধ্যে হলে সেই বাড়ীতে আর কেউ যায় না।

এই বাড়ীর অবশ্য একটা ইতিহাস আছে।

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে—এই বাড়ীতে বাস করতো গ্রামের জমিদার। জমিদারের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। জমিদার তাঁর স্ত্রীকে প্রচন্ড ভালোবাসতো।

একদিন জমিদারের স্ত্রীর প্রচন্ড পেটের ব্যামো হয়। কিন্তু তখনকার নিয়ম ছিল কোন স্ত্রীলোকের ঘরে বা অন্দর মহলে কোন পুরুষ ঢুকতে পারবে না।

তাই জমিদারের স্ত্রীর যে সেবিকা ছিল, সে যা পারতো তাই সেবা শুশ্রূষা করেছিল কিন্তু কোনভাবেই তাঁকে বাঁচাতে পারেনি।

জমিদার স্ত্রীকে এত ভালোবাসতো যে স্ত্রীর মৃতদেহের উপর মাথা রেখে মুর্চ্ছা যায়। আর কোনদিন তার জ্ঞান আসে নি। সেই থেকে বাড়ী খালি। সবাই বলে রাত্রে ওখানে ভূত-পেত্নীর আড্ডা।

ডাক্তার সুবিধের জন্য বাঁদিকের রাস্তা ধরেই হাঁটতে শুরু করলো। দূর থেকে সনাতনের নজরে পড়লো, সে ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু বলে চেঁচাতে চেঁচাতে হরিহরের সামনে এসে বললো—

এই পথ দিয়ে যাবেন না গো ডাক্তারবাবু।

—কেন, কি হয়েছে?

—রেতের বেলা এই পথ দিয়ে কেউ যায় না। এই পথ দিয়ে গেলে আপনার বিপদ হতে পারে।

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললো। দূর, আমার আবার বিপদ? আমার আবার বিপদ কিরে। তুই যা, ও আমি ঠিক চলে যাবো। বুঝিস না এদিক দিয়ে গেলে আমি একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারবো। ওদিকে আবার আমার বৌ যে আমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। যা যা।

সনাতন আর বিশেষ কিছু বলতে সাহস পেল না। শুধু মনে মনে দুর্গা নাম জপ করতে লাগল। তারপর ভাবলো—দেবতার কি কখনো ক্ষতি হয়।

সামনের দিকে তাকালে ধু-ধু প্রান্তর, চাঁদের আলোয় সবুজ প্রান্তর কেমন যেন কালচে রূপ নিয়েছে।

কিছুটা পথ যেতেই কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো—ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারবাবু, আমার সঙ্গে শিগগীর একবার চলুন।

ডাক্তার দেখলো, ধুতি পাঞ্জাবী পরা একটা মাঝ বয়স্ক ভদ্রলোক তাকে ডাকছে, ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার। কি হয়েছে?

—আমার স্ত্রীর ভীষণ শরীর খারাপ। আপনি একবার চলুন।

—আপনি কি করে জানলেন, এত রাত্রে আমি এপথ দিয়ে যাবো?

—আমি খবর পেয়েছি যে আপনি রাত্রে গ্রামে রুগী দেখতে এসেচেন। আপনি শিগগীর চলুন, নইলে ওকে বাঁচানো যাবে না। বেচারী অনেক দিন ধরে ভুগছে।

আপনাকে তো আমি আগে কোন দিন দেখিনি।

আপনি আমাকে না চিনলে কি হবে। আমি আপনাকে ভালো ভাবে চিনি ডাক্তারবাবু। আর দেরী করবেন না। পরে কথা বলবেন, এখন শিগগীর চলুন। আপনাকে যে ভাবেই হোক, আমার স্ত্রীকে ভালো করে তুলতে হবে। যত টাকা লাগে আমি দেব। আমার যথাসর্বস্য দিয়ে দেব।

—আরে বাবা আগে তো গিয়ে দেখি কি রোগ।

লোকটা ডাক্তারের ব্যাগটা নিয়ে ডাক্তারের আগে আগে যেতে লাগলো।

লোকটা গিয়ে ঢুকলো ঐ পোড়োবাড়ীতে। ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা কালো বেড়াল তার পায়ের সামনে দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার অবশ্য প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গেছিল। পরে নিজেকে সম্বিত করে লোকটার পেছনে পেছনে রুগীর ঘরে ঢুকলো।

রুগীর ঘরটা একেবারে অন্ধকার। ঘরের ভেতরের মধ্যে কেউ কাউকে দেখতে পর্যন্ত পাবে না এরকম অন্ধকার।

ডাক্তার বলে উঠলো—কি গো আপনাদের ঘরে কি কোন আলো বা বাতি নেই। আমি রুগী দেখবো কি করে।

লোকটা এবার নাকি সুরে বলল না ডাক্তারবাবু আলো-টালো জ্বালা আমার বৌ আবার সহ্য করতে পারে না। আর ওসব অভ্যেস আমাদের অনেকদিন চলে গেছে।

লোকটার কথা বলার সুরের পরিবর্তন শুনে কেমন একটা খটকা লাগলো ডাক্তারের।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো আলো না হলে রুগীকে দেখবো কি করে।

লোকটা আবার নাকি-সুরেই উত্তর দিল—ঠিক আছে। চাঁদের আলো আছে। আমি জানালাগুলো সব খুলে দিচ্ছি। আপনি রুগী দেখুন।

ডাক্তারের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। ডাক্তার অবশ্য ভূত পেত্নীকে বিশ্বাস করে। তাই ধরে নিল এটা একটা ভূতুরে বাড়ী। আর এখানে সব ভূত-পেত্নীর আড্ডা।

ডাক্তারের মনে প্রচন্ড ভয় হতে লাগলো। বুঝতে পারলো লোকটা মানুষের রূপ ধরে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য এইভাবে ঠকিয়ে নিয়ে এসেছে। মনে মনে সে রাম নাম জপ করতে লাগলো।

জানলা খুলতেই ডাক্তার দেখলো যে মানুষটা তাকে পথ দেখিয়ে তার স্ত্রীকে দেখবার নাম করে নিয়ে এসেছে সে মানুষ নয়। একটা কঙ্কাল। তার সারা দেহের হাড়গোড় সব লিক্ লিক্ করছে। চোখদু'টো যেন জ্বলছে।

ডাক্তার ভয় পেয়ে ছোট ছেলের মতো বলতে লাগলো এ আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছেন? আমি বাড়ী যাবো। আমায় ছেড়ে দিন।

শুনে কঙ্কালটা বলল—বললাম তো, যত টাকা লাগে আমি দেব। আগে আমার স্ত্রীকে ভালো করে তবে যাবেন।

এই বলে লোকটা তার স্ত্রী শরীরের চাদরটা তুলতেই দেখা গেল তাঁর সারা শরীরটা কঙ্কালের মত। চোখ দিয়ে যেন আগুনের ছটা বেরোচ্ছে।

ডাক্তার ভয় পেয়ে গেল। প্রচন্ড ভয় পেল। মূর্চ্ছা যাওয়ার মত অবস্থা হলো তার। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছিল না।

তাই দেখে কঙ্কাল লোকটা বলল—ডাক্তারবাবু ভয় পাবেন না, আমরা আপনার কোন ক্ষতি-অনিষ্ট করবো না। শুধু আমার বড় আদরের বৌকে ভালো করে দিন।

কঙ্কালটা খাটের তলা থেকে একটা বড় পুটুলি বার করে ডাক্তারের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল এই নিন আপনার যত খরচ হয় করবেন শুধু আমার বৌকে সারিয়ে তুলুন।

কঙ্কাল লোকটা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলতে লাগলো আর ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছিল, ডাক্তারও তত ভয় পেতে লাগলো, শেষে যখন ডাক্তারের একেবারে কাছে চলে আসলো তখন ডাক্তার ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরদিন ভোরবেলা। সূর্য তখনও মুখ দেখায় নি, ডাক্তারের জ্ঞান ফিরল। সে দেখতে পেল কোন এক ভাগাড়ে শুয়ে আছে। নোংরা আবর্জনার মধ্যে। পাশে কতকগুলো কুকুর নোংরা আবর্জনা গিলছে। তার মনে ভাসতে লাগলো যে, সে কাল রাত থেকে বাড়ীর বাইরে। তার বৌ ঘরে একা সারা রাত দুশ্চিন্তার মধ্যে রাত কাটিয়েছে। সারা গায়ে নোংরা লেগে রয়েছে, তাড়া হুড়ো করে উঠে পড়ে সে বাড়ীর পথে রওনা হলো। সঙ্গে নিল পুটুলি ভরা ব্যাগটা।

সারারাত বৌ তার জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল, একটুকুও ঘুমতে পারেনি সে। স্বামী ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কোথায় গেছিলে। তোমার এমন অবস্থা হলো কেন? তোমার জামা কাপড়ে এত নোংরা, এত ময়লা লাগলো কি করে? সারাটা রাত কোথায় পড়েছিলে। আর তোমার চোখ মুখের অবস্থাই বা এরকম হলো কেন? ডাক্তার বৌকে বললো

—আমাকে এক গ্লাস জল দেবে?

জল খেয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলো। তারপর গতকালের রাতের সমস্ত ঘটনা তার মনে পড়লো।

বৌকে সমস্ত ঘটনা সে বললো। কিন্তু সে কিছুতেই চিন্তা করে উঠতে পারলো না যে কি করে সে ঐ ময়লা আবর্জনায় এলো। কে তাকে ঐ আবর্জনার মধ্যে এনে ফেললো।

বৌ বললে, এখনও বুঝতে পারলে না। ঐ ভূত-পেত্নী গুলোই রাগে রাগে ঐ কান্ড করেছে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডাক্তারের মনে পড়ল সেই পুটুলিটার কথা। সে বৌকে বলল দেখতো বৌ, ঐ ব্যাগটার মধ্যে কোন পুটুলি আছে কি না।

বৌ পুটুলি খুলে দেখে হাজার হাজার মোহর। সে আশ্চর্য হয়ে গেলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো—এবার তারা বিরাট বড় লোক হবে। এতদিন যে দারিদ্র্য তাদের ঘরে ছিল তা দূর হবে। ভগবান স্বয়ং সহায় হয়েছে।

বেলা হতে গ্রামের অন্যান্য নাম করা লোকদের সমস্ত ঘটনা বলতে তারা সেই জমিদারের আর জমিদারের স্ত্রীর পুরানো ইতিহাস বললো। গ্রামের অবনী রোজাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে—জমিদারদের বংশের কেউ ছিল না তাই তাদের কোন শ্রাদ্ধশান্তি করা হয়নি। তাই আত্মারও শান্তি হয়নি। অবশ্য একটা কাজ করলে আত্মার মুক্তি ঘটবে।

ডাক্তার তখন ওঝাকে আর গ্রামের অন্যান্য লোকেদের বলল—কাল রাত্রে জমিদার ভূত আর তাঁর পেত্নী স্ত্রী আমায় প্রচুর ধন রত্ন দিয়ে গেছে। আমার বাবু ওসব বড় লোক-টোক হওয়ার ইচ্ছে নেই। তোমাদের সেবা করতে পারলেই আমার আনন্দ। আমার বৌ তাই বলছিল যে যদি জমিদারের ঐ ধন-রত্ন দিয়ে ঐ পোড়ো বাড়ীটাতে যদি একটা হাসপাতাল করি তবে গ্রামের বিরাট নাম হবে। গ্রামের লোকেরও ভালো হবে।

গ্রামের লোকেরা সবাই যেন কি রকম একটা শঙ্কিত ভাবে বলল কিন্তু ভূত পেত্নীরা কি আমাদের কাজ করতে দেবে? একে ওদের ভিটে, তার উপর বর্তমানে ওটা ওদের বসতি।

সব কিছু শুনে ওঝা বললে ওসব দোষ কাটিয়ে দেওয়া যাবে। অবশ্য একটু কিছু খরচ হবে।

ডাক্তার বলল কত টাকা।

এমন বেশী নয়। ভূত-পেত্নীর দোষ কাটাতে আমার যা দরকার তার খরচ খরচা আর তারপরে গ্রামের কেউ লোক গয়াতে গিয়ে জমিদার ভূত আর তার

পেত্নী স্ত্রীর জন্য পিন্ড দান করে এলেই সমস্ত কিছু শেষ। অবশ্যি আমায় একটু বেশী খাটতে হবে বুঝতেই তো পারছেন। এ কতদিনের ভূত-পেত্নীর বসতি। তারপর আবার কত ভালবাসা। এক সঙ্গে দু'জনের দোষ কাটাতে হবে।

গ্রামের লোকজনেরা সব যেন একটা অভয় বানী শুনলো। তারা সকলে মিলে বলল ওসব যা কিছু করতে হয়, তুমি করবে। আমরা ও সবের কিছু বুঝিনা। যাতে যা ভালো হবে তুমি তাই করো। তুমিও তো আমাদের গ্রামেরই লোক। আর বাবা গ্রামে যদি কিছু একটা হয় সেটা তো তোমারও ভালোর জন্য।

ওঝা বললে ঠিক আছে আমি যা যা বলছি সেই মত সব জোগাড় করে দাও। তার পরের সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

তারপর ওঝা পোড়োবাড়ীর ভূত-পেত্নীকে চিরদিনের মতো তাড়িয়ে দিয়ে বাড়ীটাকে দোষমুক্ত করে দিলো।

কিছুদিন পরে গয়াতে গিয়ে পিন্ডি দিয়ে আসা হলো।

তারপর হাসপাতাল তৈরীর জন্য বাড়ী ভাঙা শুরু হলো।

হাসপাতাল তৈরী হলো। গ্রামের লোকের হরিহর বাঁড়ুজ্যেকে হরিহর দেবতা বলতে লাগলো।

পরার্থে এতটুকু করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ছোটমামার ব্যাপারটা

ছোটমামা আড়ষ্ট গলায় বললেন, ঐ দ্যাখ নীলু।

সামনের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ফেললাম। একটা খুবই নিরীহ চেহারার কুকুর। একদম নেড়ি কুত্তা; যাকে বলে রোগা, লম্বাটে, মুখখানা ভীতু-ভীতু। এই কুকুরকে দেখেও ছোটমামার ভয়। অথচ মজা এই যে ছোটমামা জানোয়ারে ভীষণ ইন্টারেস্ট, যদি সেটা খাঁচার জানোয়ার হয়। এখনও এই বয়সে প্রতি মাসে একবার করে চিড়িয়াখানায় যাওয়া চাই।

গ্রামের রাস্তা, কাদায় একেবারে চটচটে। দু'পাশে মাঠ, মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তা। প্রত্যেক বছরই বোধহয় রাস্তাটার নতুন মাটি ফেলা হয়, আর বর্ষার সময় সেই মাটি আস্তে আস্তে গলে ধুয়ে যায়। গরুর গাড়ি ছাড়া এ রাস্তায় কিছু চলে না।

যখনকার কথা বলছি, তখন আমার বয়স উনিশ আর ছোটমামার বয়স পঁয়তিরিশ। ছোটমামার ছিপছিপে লম্বা চেহারা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী ছাড়া কক্ষনো কিছু পরতেন না। অদ্ভুত তাঁর বইয়ের নেশা। ঠিক পছন্দ মতন বই পেলে তা নিয়ে ছোটমামা ভুলে থাকতে পারেন। আর জানোয়ারের বই হলে তো কথাই নেই। নাওয়া খাওয়ার কথা মনে থাকে না।

সে দিনটার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

মুর্শিদাবাদ জেলার সালার নামে এক রেল স্টেশনে নেমে আমরা দু'জনে যাচ্ছিলাম সাত মাইল দূরের এক নবাব-বাড়ীতে। আসল নবাব নয়, তাদেরই হয়তো দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়। কিংবা অনেক ছোটখাটো মুসলমান জমিদারদেরও লোকে নবাব বলত। যেমন অনেক হিন্দু জমিদারের বাড়ীকেই লোকে বলত রাজবাড়ী।

এই নবাব বাড়ীতে অনেক পুরোন বই আছে শুনেছিলাম। আগেকার দিনে নবাবরা চিতাবাঘ-টিতাবাঘ পুষত, তাই ছোটমামার বিশ্বাস, এ বাড়ীতেও জানোয়ারের বই থাকা আশ্চর্য নয়। আমরা যাচ্ছিলাম সেই বইয়ের খোঁজে।

গরুর গাড়ি ছাড়া এই সাত মাইল পথ যাবার আর কোন ব্যবস্থা নেই। অন্তত তখন ছিল না। গরুর গাড়িটা আমার খুব পছন্দ নয়। ছোটমামাও বলেছিলেন, ফেরার সময় বইপত্র নিয়ে তো গরুর গাড়িতে আসতেই হবে; চল, এখন হেঁটেই যাই।

পথের মধ্যে সেই কুকুর। গ্রামের রাস্তায় এরকম একটা দুটো কুকুর তো থাকবেই। ছোটমামাকে নিয়ে বাইরে বেরুনোর এই এক মুস্কিল।

ছোটমামা যেমন কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়েছেন, কুকুরটাও সেই রকম আমাদের দেখে ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

ছোটমামা বললেন, নীলু কুকুরটাকে তাড়া।

আমি বললাম, ও কিচ্ছু করবে না। আমরা এগোলেই ও সরে যাবে।

উঁহুঃ! পাগলা কুকুর হতে পারে। দেখছিস না, ল্যাজ ঝোলা।

ভয় পেলে সব কুকুরেরই ল্যাজ ঝুলে যায়।

জিভ বার করে আছে।

হাঁপিয়ে গেছে বোধহয়। কুকুর জিভ বার করে দম নেয়।

কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হয় জানিস? নেড়ি কুত্তা কামড়ালেও হয়, বুলডগ কামড়ালেও হয়।

কুকুরের ব্যাপারে আমিও যে খুব একটা সাহসী তা নয়। অনেক জায়গায় খুব বড় সাইজের এ্যালসেসিয়ান, গ্রেটডেন বা ডোবারম্যান জাতীয় কুকুর দেখলে আমারও বুক ধড়ফড় করে। কিন্তু একটা রোগা নেড়ি কুত্তা খুব কাছে এলে ওকে তো একটা লাথি মেরেও হটিয়ে দিতে পারব।

আমি বললাম, এই যা, যাঃ।

কুকুরটা খুব আস্তে ঘেউ করে উঠল। সেটা ঠিক রাগের ডাক নয়, যেন ভয়ে ভয়ে কোন অনুরোধ জানাচ্ছে।

ছোটমামা বললেন, দেখলি! রাস্তা ছেড়ে যাবে না।

আমি বললাম, ও এদিকেই আসতে চায়।

আকাশে কালো মেঘ। রাস্তার দু'পাশের ধান ক্ষেতে খুব গাঢ় সবুজ রঙের কচি কচি ধান। মেঘের ছায়ায় ধানের সেই সবুজ রঙও পাল্টে গেছে। যে-কোন সময় বৃষ্টি আসতে পারে, আমাদের তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। ছোটমামার কাছে ছাতা আছে, কিন্তু এই রকম ফাঁকা জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে ছাতায় কোন কাজ হয় না।

কুকুরটা আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। খুব সম্ভবত সে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছিল, কিন্তু ওকে এগোতে দেখেই ছোটমামা রাস্তায় বাঁ-দিকের ঢালু জায়গাটা দিয়ে দৌড়ে খানিকটা নিচে নেমে গেলেন।

কত ছোটখাটো ঘটনা থেকে বিরাট কাণ্ড হয়ে যায়। সেদিন ছোটমামা রাস্তাটার বাঁ-দিকে না নেমে যদি ডানদিকে নামতেন, তাহলে তাঁর জীবনটা এরকম সাংঘাতিকভাবে বদলে যেত না। কিছুই হতো না।

ছোটমামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিচে নেমে এলাম। ভাবলাম কুকুরটা এবার পার হয়ে যাবে। কিন্তু কুকুরটাও নেমে এল বাঁ দিকের ঢালু ধার দিয়ে। খানিকটা দূরত্ব রেখে গর-র-র গর-র-র আওয়াজ করতে লাগল।

ছোটমামা বললেন, বলেছিলাম না পাগলা কুকুর। খবরদার, দৌড়বার চেষ্টা করিস না।

আমার তখনও কুকুরটা পাগলা বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ কুকুরটার মুখ চোখে রাগের ভাব নেই। গলা দিয়ে আওয়াজ করছে বটে, কিন্তু সেটাও বেশ নরমভাবে।

আমরা দু'জনে কুকুরটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের পেছন দিকে একটা ঝোপ। সামনে খানিকদূরে একটা নোংরা জলের ডোবা। কাছাকাছি কোন বাড়ী ঘর বা মানুষজন নেই।

কুকুরটা সেইরকম আওয়াজ করতে করতে এক পা এক পা করে আমাদের

দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। ছোটমামা ছাতাটা বাগিয়ে ধরলেন। আমি 'হুস-হাস, যাঃ' বলতে লাগলাম।

খুব ভীতু লোকেরাও একসময় খুব সাহসী হয়ে ওঠে। কুকুরটা আর একটু কাছাকাছি আসতেই ছোটমামা নিজে দু'পা এগিয়ে ছাতাটা দিয়ে ওর পিঠে খুব জোরে এক ঘা কষালেন।

কুকুরটা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু উল্টে আমাদের আক্রমণ না করে সে পেছন ফিরে প্রাণপণে দৌড় মারল।

ছোটমামা বীরের মতন বললেন, দেখলি, ব্যাটাকে দিয়েছি ঠান্ডা করে।

কিন্তু ততক্ষণে আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। কুকুরটা খুব জোরে পালাতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল সেই ডোবাটার মধ্যে। জলের মধ্যে দাপাদাপি করল একটুক্ষণ, তারপর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল আবার। কুকুরটা ঘাড় কাত করে ভাসছে, তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয়, মরে গেছে।

আমরা হতবাক। কুকুর কখনো জলে ডোবে না, সব জন্তু-জানোয়ারই জন্ম থেকে সাঁতারু। তাহলে কুকুরটা মরে গেল কেন? তাহলে কি ছোটমামার ছাতার ঘা খেয়েই মরে গেল? কিন্তু সব নেড়ি কুত্তাই তো খুব মারধোর খায়, এক ঘা ছাতার বাড়ি খেয়ে তার তো কিছু হবার কথা নয়।

আমরা ডোবাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। কুকুরটা যে মরে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোটমামা আর আমি চোখাচোখি করলাম কয়েকবার, কিছুই বুঝতে পারলাম না আমরা। ছোটমামার নরম মন, তাঁর মুখখানা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। তিনি কুকুরটাকে মেরে ফেলতে চান নি মোটেই।

এমন হতে পারে যে কুকুরটা খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। ও যে কোন সময় মরতে পারত। ছাতার ঘা খেয়ে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ফেল করেছে।

এই সময় কুঁই কুঁই শব্দ পেয়ে আমরা আবার চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। ঝোপটার আড়াল থেকে তুরতুরে পায়ে বেরিয়ে আসছে তিন-চারটে কুকুরছানা। তখন সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ কুকুরটা আমাদের তাড়া করে আসেনি। ও ওর বাচ্চাদের কাছে আসতে চাইছিল। আমরাই বা সেটা বুঝব কী করে? সব কুকুরকেই আমরা কুকুর বলি, কিন্তু

ওটা ছিল কুকুরী। ছানাগুলো ঘুমোচ্ছিল বোধহয়, আওয়াজ শুনে জেগে উঠেছে।

আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল! মা মরে গেল, এখন বাচ্চাগুলোর কী হবে? আমরাই বা এখন কী করব? নবাব বাড়ীতে যাচ্ছি, সেখানে তো আর কয়েকটা নেড়ি কুত্তার বাচ্চা কোলে করে নিয়ে যাওয়া যায় না।

এমন সময় টপাটপ ফোঁটার বৃষ্টি নামল। বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে বাজ ডাকল একবার। ছোটমামা বললেন, এবার চল, ওরা ঠিক বেঁচে যাবে। একমত হয়ে আমিও উঠে এলাম রাস্তার ওপর। মনে হল যেন মরা কুকুরীটা তখনও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

খানিকটা যেতে না যেতেই শুরু হলো ঝড়। আকাশের এদিক থেকে ওদিক চিরে যেতে লাগলো বিদ্যুতে। আর কী অসম্ভব জোরে বজ্রের আওয়াজ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে এই আওয়াজ যে কত সাংঘাতিক তা সেদিনই বুঝেছিলাম। মনে হয় যেন একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে।

হাঁটবার বদলে আমরা প্রায় দৌড়োতে শুরু করেছি। রাস্তার ধারে একটা খেজুরগাছ দেখে ছোটমামা বললেন, আয়, এখানে একটু দাঁড়াই।

আমি বললাম, না, এখনো জোরে বৃষ্টি নামে নি। চল, সামনে কোন গ্রাম-ট্রাম পাওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জোরে একটা বাজ পড়ল। আমি চোখ বুজে কান ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু পরে চোখ মেলে দেখি, ছোটমামা খেজুর গাছটার কাছেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। আর গাছটার রং হয়ে গেছে কালো।

আমার বুকের মধ্যেও যেন একটা বাজ ডেকে উঠল। বজ্রপাতে মানুষ মরে যাবার কথা শুনেছি। তবে কী তাই হলো? ছুটে গেলাম ছোটমামার কাছে। পিঠে হাত রেখে বললাম, ছোটমামা!

ছোটমামা চোখ মেলে বললেন, কী?

আমি একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার মাথায় যেন ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি।

ছোটমামা, তোমার কিছু হয়নি তো?

না তো! আমি রাস্তায় শুয়ে আছি কেন?

পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলে বোধহয়। উঠতে পারবে?

হ্যাঁ, কেন পারব না?

ছোটমামা নিজে উঠে দাঁড়ালেন। ছাতাটা ছিটকে একপাশে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে তুলে নিলাম। আমার জন্য অপেক্ষা না করেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন ছোটমামা। আমি এগিয়ে গিয়ে দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম, ছোটমামা কোন উত্তর দিলেন না। মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। ছোটমামার চোখে চশমা নেই। অথচ চশমা ছাড়া উনি ভাল দেখতে পান না। হাঁটতে পর্যন্ত অসুবিধে হয়।

ছোটমামা, তোমার চশমা?

ভুরু কুঁচকে ছোটমামা বলেন, চশমা! আমার চশমা ছিল তাই না! সেটা কোথায় গেল?

আমি দেখছি।

দৌড়ে ফিরে গেলাম খেজুরগাছটার কাছে। একটু খুঁজতেই চশমাটা পাওয়া গেল। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ছোটমামা, তোমার সত্যি কিছু হয় নি? শরীর ঠিক আছে তো?

কোন উত্তর না দিয়ে আমার কাছ থেকে চশমাটা নিয়ে ছোটমামা আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

যে রকম মেঘ ডাকছিল, সেই তুলনায় জোর বৃষ্টি হল না। আমরা সন্ধ্যের একটু আগেই পৌঁছে গেলাম নবাব বাড়ীতে।

সে বাড়ী দেখলে কান্না পায়। একসময় নিশ্চয়ই দারুণ ব্যাপার ছিল, এখন অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে একটা ভগ্নস্তূপ। সিংহদ্বারের একটা সিংহ এখনো টিকে আছে, অন্যদিকে কিছুই নেই। কোথাও দাঁড়িয়ে আছে শুধু একখানা দেয়াল, কোথাও একখানা দু'খানা ঘর আস্ত আছে, কিন্তু দরজা জানলা নেই। মনে হয়, সাত মহলা না হলেও তিন চার মহলা প্রাসাদ ছিল। এখন এই ভাঙাচুরো বাড়ীর মধ্যেও কিন্তু অনেক লোক আছে। জোড়াতালি দিয়ে থাকে, কেউ এ বাড়ী সারাবার কথা চিন্তা করে না।

একটু খোঁজ করতেই নবাবকে পাওয়া গেল। বর্তমান নবাবের বয়েস খুব কম। বাইশ তেইশ বছর মাত্র, নবাবী-চাল কিছু নেই। প্যান্ট-শার্ট পরা সাধারণ কলেজের ছাত্রদের মতন মনে হয়। বেশ হাসি-খুশি। ছোটমামার কাছে

হাইকোর্টের জর্জ ইউসুফ সাহেবের একটা চিঠি ছিল। সেটা দেখে তরুণ নবাব বললেন, বইপত্র সব প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, উইপোকায় শেষ করে দিয়েছে। আপনারা দেখে ইচ্ছে মতন যে-কটা খুশি নিতে পারেন। আমি শিগগির পাকাপাকিভাবে বিলেত চলে যাচ্ছি, তাই যা আছে সব বিলিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

গোটা একটা বাড়ীতে নাকি ছিল লাইব্রেরী। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে বাড়িটা কিন্তু এখনো পুরোপুরি ভেঙে যায় নি। দু'তিনখানা ঘর এখনো প্রায় আস্তই আছে। একটা ঘরে ঢুকে দেখলাম, বইপত্রে একেবারে পাহাড় হয়ে আছে। খুব সম্ভবত আগে এ ঘরে বড় বড় আলমারি বা কাঠের র‍্যাক ছিল। কেউ একজন তার থেকে সব বইগুলো বার করে মেঝেতে ফেলে সেই আলমারি আর র‍্যাক বিক্রি করে দিয়েছে। অধিকাংশ বই-ই ছিঁড়ে কুটিকুটি।

ছোটমামা আন্দাজে ভুল করেন নি। জানোয়ারের বইও বেরুল দু'একখানা। অতিকষ্টে গোটা চারেক বই আমরা বেছে নিতে পারলাম। বাকি আবার কাল সকালে দেখব বলে বেরিয়ে এলাম। ধুলো আর ভ্যাপসা গন্ধে ভরা ঐ ঘরের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকলে দম আটকে আসে।

অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও নবাব বাড়ীর আতিথ্য এখনো বেশ উঁচুদরের। ছোটমামার জামা-কাপড়ে কাদা লেগে গিয়েছিল বলে ওঁকে দেওয়া হল একটা সিল্কের লুঙ্গি আর একটা ভাঁজ ভাঙা পাঞ্জাবী। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া জমলো বেশ, তিনরকম কাবাব আর ঘি চপচপে পরোটা। থাকার জন্য একটা ঘরও পাওয়া গেল। সেখানটায় একতলার সব ঘর আবর্জনায় ভর্তি, কিন্তু সিঁড়ি আর দোতলার একটা ঘর অটুট আছে। সেখানে পাশাপাশি দু'খানা খাটে পরিষ্কার চাদর পাতা। নবাব নিজে এসে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে গেলেন। আমাদের খুবই অসুবিধে হবে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন বারবার। আমরা খুব 'না' 'না' বলতে লাগলাম। আমি একাই কথা বললাম অবশ্য, ছোটমামাও সেই বিকেলের পর থেকে কথা বলছেন খুব কম।

ইলেকট্রিসিটি নেই, একটা হ্যারিকেন রাখা হয়েছে আমাদের ঘরে। ছোটমামা সেই টিমটিমে আলোতেই একটা বই খুলে বসেছেন। কিছুক্ষণ বই না পড়ে ছোটমামা ঘুমোবেন না আমি জানি। কিন্তু আমার ঘুম পেয়ে গেছে।

আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে, আর সারা রাত বৃষ্টি পড়লেও কোন ক্ষতি নেই, ঘুমটা জমবে ভালো। অবশ্য বেশী বৃষ্টি হলে এই বাড়ীটা না ধ্বসে পড়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কেউ যেন একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে। এত রাত্রে এ রকম ইয়ার্কি কে করে? পাশ ফিরে দেখলাম নিজের খাটের ওপর সোজা হয়ে বসে ছোটমামা এক মনে বই পড়ছেন।

ছোটমামা, কোনো আওয়াজ শুনেছো? ছোটমামা শুধু আমার দিকে একবার তাকালেন। কোন উত্তর দিলেন না। পড়ার সময় ডিসটার্ব করা পছন্দ করেন না ছোটমামা। আমি ভাবলাম, তাহলে ঘুমের মধ্যে নিশ্চয়ই আমি ভুল শুনেছি। পাতলা ঘুমের মধ্যে এরকম অনেক অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়।

আবার চোখ বুজলাম। কিন্তু কিসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি। খুব খারাপ গন্ধটা। অথচ একটা চেনা-চেনা। যাই হোক, ঘুমোবার চেষ্টা করলাম জোর করে। গন্ধটা যেন বেড়েই যেতে লাগল। এবার চিনতে পারলাম। ছোটমামার সঙ্গেই চিড়িয়াখানায় গেছি কয়েকবার, সেখানে বাঘ-সিংহের খাঁচার সামনে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। সেই রকমই বোঁটকা গন্ধ। তখন মনে হল, একটু আগে যে আওয়াজটা শুনেছিলাম, সেটাও যেন বাঘের ডাকের মতন।

তক্ষুনি আবার সেই রকম বাঘের ডাক শোনা গেল। একেবারে ঘরের মধ্যে। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখলাম, সামনে খোলা বইখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছোটমামা আওয়াজ করছেন উম্‌মা! উম্‌মা! অবিকল বাঘের মতন। ঘরটাতে অসম্ভব বোঁটকা গন্ধ।

ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলেও আমি ডাকলাম ছোটমামা!

ছোটমামা ডাক থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন। একদম অন্যরকম মুখ। অসম্ভব হিংস্র। গলা দিয়ে গ-র-র-র আওয়াজ বেরুচ্ছে।

ছোটমামার বদলে অন্য কোন লোক হলে আমি কী করতাম জানি না। কিন্তু ইনি তো আমার নিজের ছোটমামা। খাট থেকে লাফিয়ে উঠে ছোটমামাকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, ছোটমামা! ছোটমামা! কী হয়েছে? তোমার কী হয়েছে?

তাকিয়ে দেখলাম, ছোটমামার সামনের খোলা বইটাতে একটা বাঘের ছবি।

কিছু না ভেবেই আমি বইটা বন্ধ করে দিলাম।

ছোটমামা অমনি সাধারণ গলায় বললেন, কিছু হয়নি তো! তুই অমন করছিস কেন?

তুমি ওরকম শব্দ করছিলে কেন? ঘরে কিসের গন্ধ?

কই, কিছু না তো! আমি তো গন্ধ পাচ্ছি না।

আমি ভয়ে ভয়ে খাটের তলা দেখলাম। কিন্তু দোতলার ওপর খাটের নিচে তো বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে না! তাছাড়া আওয়াজটা ছোটমামাকেই করতে শুনেছি। ছোটমামা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন? না মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

ছোটমামা হাই তুলে বললেন, আমিও এবার শুয়ে পড়ব।

হ্যারিকেনটা কমিয়ে রাখা হল খাটের পাশে। ছোটমামা একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে নীলু, কুকুরটাকে কি আমিই মেরে ফেললাম?

আমি বললাম, না, এত সহজে কি কুকুর মরে?

হয়তো আমার ছাতার ঘায়ে ওর শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল। তাই জলে পড়ে গিয়ে...

আমার তা মনে হয় না। ওর নিশ্চয়ই মরবার সময় হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ গলার আওয়াজটা বদলে ফেলে ছোটমামা হুংকার দিয়ে বললেন, বেশ করেছি মেরেছি। একটা পাগলা কুকুর তেড়ে এলে মারবো না?

আমার ছোটমামা বরাবরই শান্ত স্বভাবের মানুষ। কোন দিন এরকম দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কথা বলেন না। কিন্তু এ সবের চেয়েও আমি বাঘের ডাকটার কথা বেশী চিন্তা করছিলাম। ছোটমামা এরকম বাঘের মতন ডাকতে পারেন? কোনদিন শুনিনি আগে। ছোটমামা আমায় ভয় দেখাতে চাইছিলেন? তাহলে বাঘের গায়ের বোঁটকা গন্ধটা আমি পেলাম কী করে? ওটাও কি আমি মনে মনে কল্পনা করেছি? গন্ধটা এখনো ঘর থেকে যায়নি পুরোপুরি।

রাতে আর কিছু হল না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমামা বললেন, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

আমি বাঘের প্রসঙ্গটা একটু তুলতে যেতেই ছোটমামা বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস! এই মুর্শিদাবাদে বাঘ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

একটু বেলা হতেই তরুণ নবাব এলেন আমাদের খোঁজ খবর নিতে। চা খাবার পর বললেন, চলুন, বই দেখতে যাবেন না?

ছোটমামার কোন উৎসাহ দেখলাম না। বইয়ের ঘরে ঢুকেও ছোটমামা চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা বইও ছুঁয়ে দেখলেন না। যে ছোটমামা বইয়ের পোকা, যার জন্য এতদূরে আসা। আস্ত দেখে পঁচিশ-তিরিশখানা বই বেছে নিয়ে বললাম, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে। কয়েকটা বান্ডিলে বেঁধে নিলাম বইগুলো।

ফেরার পথে আমরা এলাম গরুর গাড়িতে। নবাবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম সেটাতে। বিদায় নেবার সময় ছোটমামা একটাও কথা বললেন না। আমার খুব লজ্জা করছিল।

আগের দিন যেখানে সেই ঘটনাটা ঘটেছিল, সে জায়গাটা মনে ছিল আমার। রাস্তার ওপর থেকেই নিচের সেই ডোবাটা দেখা যায়। মরা কুকুরটা এখনো জলে ভাসছে। বাচ্চাগুলোকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আমি পাশে তাকিয়ে দেখলাম, ছোটমামা চোখ বন্ধ করে আছেন, আর বিড় বিড় করে কী যেন বলছেন। ছোটমামার ব্যবহার দেখে আমি রীতিমতন চিন্তায় পড়ে গেছি। কলকাতায় ফিরেই ডাক্তার দেখাতে হবে। সামান্য একটা কুকুরকে মারা নিয়ে কী যেন হয়ে গেল। তাও তো ইচ্ছে করে মারা হয়নি। কিংবা ঐ যে বাজের আওয়াজে ছোটমামার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, সেই জন্যই এসব হচ্ছে। কিন্তু কুকুরটার জন্য এখানে দেরি না হলে বাজ পড়বার আগেই অনেকটা চলে যেতাম।

স্টেশনে এসে মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম একটা ট্রেন। উঠে পড়লাম টিকিট কেটে। আমাদের কামরায় খুব বেশী ভিড় নেই। একটাই মাত্র জানলার ধারে সীট ছিল, সেটা ছোটমামাকে দিয়ে আমি বসলাম পাশে। ছোটমামা আবার চোখ বুজে বিড়বিড় করতে লাগলেন।

আধঘন্টাখানেক বাদে ছোটমামা আবার চোখ মেলে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। দে তো একটা বই পড়ি।

আমি খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি একটা বইয়ের বান্ডিল খুলতে গেলাম। ছোটমামা অন্য একটা বান্ডিলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ওর থেকে তিন নম্বর বইটা দে।

একটা চওড়া মতন বই, জার্মান ভাষায় লেখা, ভেতরে অনেক জন্তু-জানোয়ারের ছবি। বইটা ছোটমামার দিকে এগিয়ে দিলাম।

ছোটমামা বইখানা মাঝখানের একটা পাতা উল্টেই চোখ বিস্ফারিত করে ফেললেন। একটা অদ্ভুত চীৎকার করে বইটা ছুঁড়ে দিলেন কামরার মেঝেতে।

কামরার সবাই আমাদের দিকে তাকাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল ছোটমামা?

ছোটমামা কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলেন। নকল কুকুরের ডাক নয়। ঠিক যেন একটা আসল কুকুর ডাকছে।

বহু লোক ভিড় করে এল আমাদের দিকে। ছোটমামা তখনও ডেকে চলেছেন। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে ঠাট্টা মনে করে হাসতে লাগল। আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আমি ঝুঁকে ছোটমামার হাত ধরে বললাম, কী হয়েছে ছোটমামা, এরকম করছ কেন?

ছোটমামা খ্যাঁক করে আমার হাত কামড়ে ধরলেন দারুণ জোরে। অন্য লোকেরা এসে তাড়াতাড়ি না ছাড়িয়ে দিলে ছোটমামা বোধহয় আমার হাতের মাংসই তুলে নিতেন। আমাকে ছাড়বার পরই ছোটমামা অন্যদের কামড়াতে গেলেন, তখন সবাই ছোটমামাকে দমাদম করে মারতে শুরু করল।

এ রকম অবস্থায় আমি জীবনে কখনো পড়িনি। আমার কান্না পেয়ে গেল। আমার ছোটমামাকে অন্য লোকে মারছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোটমামাকে আড়াল করে কাতর গলায় বললাম, ছেড়ে দিন, দয়া করে ছেড়ে দিন।

ছোটমামা তখনই আবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, কী হয়েছে রে নীলু! লোকগুলো এমন ক্ষেপে গেল কেন?

একজন লোক মাটিতে ওল্টানো বইটা তুলে এনে দিল আমার হাতে। খোলা পাতাটায় একটা কুকুরের ছবি।

অনেক লোক তখনো বলতে লাগল, নামিয়ে দিন, লোকটাকে নামিয়ে দিন। আমি হাত জোড় করে সকলের কাছে ক্ষমা চাইলাম। ছোটমামা বারবার অসহায়ভাবে বলতে লাগলেন, লোকগুলো এত রাগ করছে কেন? কী হয়েছে?

আমার হাত থেকে রক্ত বেরুচ্ছিল। আমি সেখানে একটা রুমাল চাপা দিয়ে বললাম, কিচ্ছু হয়নি। তুমি চোখ বুজে থাক।

আমাদের কাছাকাছি আর কোন লোক বসল না।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম ভালভাবেই। ট্রেনের দু'জন সহযাত্রী আমার প্রতি দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। বেশ শান্তভাবেই ট্যাক্সিতে উঠলেন ছোটমামা। এমনকি লোক দুটিকে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালেন। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর আমাকে বললেন, বেশ ভাল লোক তো ওরা। এবার বেড়ানোটা তেমন ভাল হল না, সকাল থেকে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল কেমন যেন।

আমি বললাম, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি বোধহয়। বাড়ী গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুই ভাল বই এনেছিস তো? আমার আর কিছু দেখা হল না।

হ্যাঁ, ভাল বই আছে কয়েকটা।

দেখি, দে তো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বইগুলো আড়াল করে বললাম, না, এখন নয়, বাড়ীতে গিয়ে দেখবে!

ছোটমামা আর জোর করলেন না। বললেন, সত্যি রে, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

আমরা তখন থাকি মোমিনপুরের কাছে। ট্যাক্সিটা চলছে খুব আস্তে আস্তে। হঠাৎ পাশেই একটা ডুমডুম আওয়াজ পেলাম। ছোটমামা চোখ বুজে ছিলেন। অমনি আবার চোখ মেলে খাড়া হয়ে বসলেন। আমি দেখলাম, আমাদের ট্যাক্সির পাশ দিয়ে একজন বাঁদর-নাচওয়ালা চলেছে দুটো বাঁদর নিয়ে।

ছোটমামা মুখ দিয়ে দু'বার হুপহুপ করে ঝট্ করে ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে গেলেন রাস্তায়। তারপর লাফাতে লাগলেন, সেই বাঁদর দুটোর পাশে। আর অবিকল একটা গোদা বাঁদরের মতন দাঁত মুখ খিঁচোতে লাগলেন বাঁদরওয়ালার দিকে!

একটা দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। কলকাতার রাস্তায় ভিড় জমতে এক মিনিট দেরি হয় না। তা ছাড়া এমন দৃশ্য, একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোক বাঁদরের মতন শব্দ করছে আর লাফাচ্ছে।

ছোটমামাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ঠিকই। তারপর তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছে। কোন ডাক্তার তাঁর মধ্যে পাগলামির কোন চিহ্ন খুঁজে

পান নি। কিন্তু তাঁর পাগলামি দিন দিনই বাড়তে লাগল। এমনিতে ছোটমামা খুব চমৎকার স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু কোন জন্তু-জানোয়ার দেখলে কিংবা বইতে কোন জন্তু-জানোয়োরের ছবি, এমনকি নামটা দেখলেও তিনি বদলে যান। অমনি সেই জন্তুটির লক্ষণ তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে। কোন ওষুধে কোন কাজ হল না।

শেষ পর্যন্ত ছোটমামাকে রাখা হল মধুপুরের একটা ফাঁকা বাড়ীতে। সে বাড়ীতে কোন ছাগল বা বেড়ালও ঢুকতে দেওয়া হয় না। ছোটমামা সর্বক্ষণ অঙ্ক বা জ্যামিতির বই পড়েন। গল্পের বই পড়া একেবারে বন্ধ। কারণ আমি দেখেছি, বাংলা বা ইংরেজীতে এমন কোন গল্পের বই নেই, যেখানে একবার না একবার কোন না কোন জন্তু-জানোয়ারের উল্লেখ থাকে না। একবার একটা বইতে শুধু 'বিড়ালের মতন সতর্ক' এই লাইনটা পড়েই ছোটমামা বেড়াল ডাক ডাকতে শুরু করেছিলেন।

আমার মনে হয়, পশুসমাজের কোন আলাদা ব্যবস্থা আছে। তারাই কোন রহস্যময় উপায়ে ছোটমামার ওপর এরকম প্রতিশোধ নিয়েছে। যদিও জানি, আমার এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য মধুপুরে গিয়ে যে কেউ আমার ছোটমামাকে এখনো দেখে আসতে পারে।

আর একটা কথাও আমার প্রায়ই মনে হয়। সেদিন কেন সেই মাটির রাস্তাটার বাঁদিকে না নেমে ডান দিকে নামলাম না আমরা! তাহলেই তো সব ঠিকঠাক থাকত।

রাক্ষুসে পাথর

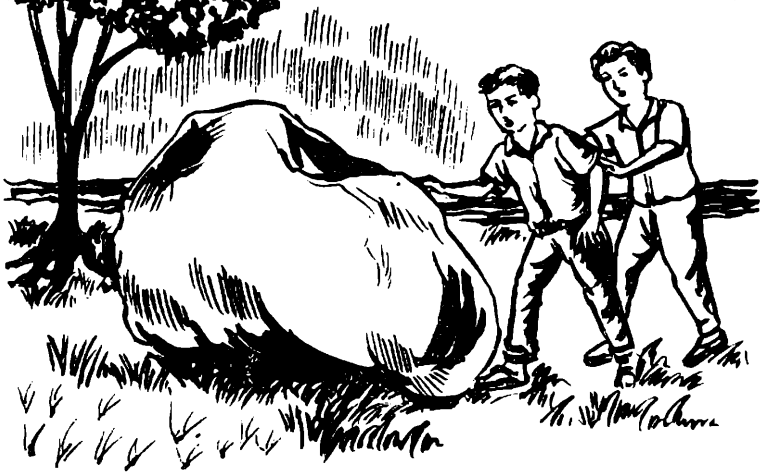

বুড়ো মাঝি বললো, বাবু বেড়াতে এসেছেন, বেড়িয়ে ফিরে যান। ঐ দ্বীপে যাবেন না, ওখানে দোষ লেগেছে।

আমরা একটু অবাক হলাম। দোষ লেগেছে মানে কী? দ্বীপের আবার দোষ লাগে কী করে?

বিমান বললো, বুড়ো কর্তা, তুমি যা টাকা চেয়েছো, তাই দিতে আমরা রাজি হয়েছি। তবু তুমি আমাদের নিয়ে যাচ্ছো না কেন? ঐ দ্বীপে কি আছে?

বুড়ো মাঝি তার সাদা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললো, কিছুই নেই, সেই কথাই তো বলছি। শুধুশুধু ওখানে গিয়ে কী করবেন?

বুড়ো মাঝি হাল ধরেছে, আর দাঁড় বাইছে তার নাতি। এই নাতির বয়েস তো চোদ্দ বছর হবে। ওর নাম সুলতান, সে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

বুড়ো মাঝি যতই 'না' বলছে, ততই আমাদের জেদ চেপে যাচ্ছে। একটা সাধারণ দ্বীপ, সেখানে কি এমন ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে? কত জাহাজ যাচ্ছে এখান দিয়ে, সে রকম কিছু থাকলে সবাই জানতে পারতো।

হলদিয়াতে বিমানের দাদা চাকরি করে। আমি আর বিমান কয়েক দিনের জন্য এসেছি এখানে বেড়াতে। হলদিয়া জায়গাটা বেশ সুন্দর। নতুন বন্দর, নতুন শহর গড়ে উঠেছে। চারদিকে সবই নতুন নতুন বাড়ি আর অনেক ফাঁকা জায়গা। শহরটার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে হলদি নদী।

সকালবেলা নদীর ধারে জেলেরা মাছ বিক্রী করতে আসে। আমরা সেই মাছ কিনতে গিয়েছিলুম। ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বাঁধা। নৌকো দেখেই আমাদের মনে হলো, একটা নৌকো ভাড়া করে নদীতে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়। একজন মাঝিকে জিজ্ঞেস করতেই সে রাজি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা দিলে সে যতক্ষণ ইচ্ছে আমাদের ঘুরিয়ে আনবে।

আমি আর বিমান দু'জনেই সাঁতার জানি, সুতরাং আমাদের জলের ভয় নেই। বিমান তো সুইমিং কমপিটিশনে অনেকবার প্রাইজ পেয়েছে।

আমি আগেই শুনেছিলাম যে হলদিয়ার কাছে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম আগুনমারির চর। আগে সেই চরটা মাঝে মাঝে ডুবে যেত আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠতো। এখন আর ডোবে না। এখন সেখানে গাছপালা জন্মে গেছে। কোনো মানুষজন অবশ্য সেখানে এখন থাকে না।

নৌকো দেখেই আমার ঐ দ্বীপটার কথা মনে এসেছিল। নতুন দ্বীপ মানেই তো নতুন দেশ। ওখানে থেকে ঘুরে এলেই একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন বাদে, যখন ঐ দ্বীপেও অনেক ঘর-বাড়ী হয়ে যাবে, কলকারখানা বসবে, তখন আমরা বলবো, জানো, যখন আমরা আগুনমারিতে গিয়েছিলুম, তখন এসব কিছু ছিল না, শুধু গাছপালা আর...

গাছপালা ছাড়া আর কী আছে সেই দ্বীপে? বুড়ো মাঝি ভয় পাচ্ছে কেন?

নৌকোয় চড়বার সময় মাঝিদের কক্ষনো চটাতে নেই। সেইজন্য আমি অনুনয় করে বললুম, ও বুড়ো কর্তা, বলো না সেখানে কী আছে? কেন আমাদের যেতে বারণ করছো?

বুড়ো মাঝি বললো, কিছু নেই তো বলছি গো বাবু। শুধু কয়েকটা গাছ আর বালি, আর ঐ শামুক ঝিনুক ভাঙা।

বিমান বললো, তাহলে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইছো না কেন? সেখানে কি ভয়ের কিছু আছে?

বুড়ো মাঝি বললো, আকাশে মেঘ দেখো না বাবু। এখন আর অতদূরে যাওয়া ঠিক নয়। এই কিনারায় কিনারায় থাকা ভালো!

বিমান বললো, তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছো? সামান্য মেঘ, এতে কখনো ঝড় ওঠে? তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাওনা তাই বলো।

আমি বুড়ো মাঝির নাতিকে জিজ্ঞেস করলুম, সুলেমান, তুমি গেছো সেই দ্বীপে? সেখানে ভয়ের কিছু আছে?

সুলেমান তার দাদুর দিকে তাকালো একবার। তারপর বললো, কিছু নাইকো। অন্য কিছু দেখাও যায় না। তবে সেখানে গেলে যেন একটা কেমন কেমন করে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

এ তো আরও অদ্ভুত কথা, একটা দ্বীপে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়! আমি আর বিমান দু'জনেই হেসে উঠলুম। তা হলে তো যেতেই হবে সেখানে।

বুড়ো মাঝিকে বললুম, তুমি যদি না নিয়ে যেতে চাও তো আমাদের ফিরত নিয়ে চলো। আমরা অন্য নৌকো ভাড়া করবো।

বুড়ো মাঝি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, সে টাকা ফেরত দেওয়া পাপ। তবে চলেন নিয়ে যাই। পরে যেন আমাকে দোষ দেবেন না। ওরে সুলেমান, ভালো করে টান।

আকাশে মেঘ আছে বটে কিন্তু জমাট কালো নয়। সেই মেঘের ছায়া পড়েছে জলে। রোদ নেই, বেশ ছায়া-ছায়া ছিল। নদীতে বড় বড় ঢেউ। এখানে নদী প্রায় সমুদ্রের মতন। এপার ওপার দেখাই যায় না। পাশ দিয়ে জাহাজ কিংবা স্টিমার গেলে আমাদের নৌকোটা দুলে দুলে উঠছে।

খানিকক্ষণ পরে বুড়ো মাঝি ডানদিকে হাত তুলে বললো, ঐ যে দ্যাখেন, আগুনমারির চড়া। দেখলেন তো?

আমি আর বিমান দু'জনেই ঘাড় ফেরালুম। মনে হলো নদীর বুকেই যেন কয়েকটা গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি দেখা যাচ্ছে না।

বুড়ো মাঝি বললে, দেখা হলো তো? এবারে নৌকো ঘোরাই?

আমি আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠলুম, সে কি, আমরা কাছে যাবো না!

—কাছে গিয়ে আর কী করবেন? আর তো দেখার কিছু নাই!

বিমান এবারে বেশ রেগে গিয়ে বললো, তোমার মতলব কি বলো তো, বুড়ো কর্তা? ঐ দ্বীপে কি তোমার কোনো জিনিসপত্তর আছে? ওখানে আমাদের যেতে দিতে চাও না কেন?

বুড়ো মাঝি আমতা আমতা করে বললো, দেখা তো হলোই, আরোও কাছে গিয়ে লাভটা কী?

বিমান বললে, লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমরা ঐ দ্বীপে নেমে হাঁটতে চাই।

বুড়ো মাঝি এবারে খুব জোরে হাল ঘোরাতেই নৌকোটা তরতরিয়ে এগিয়ে গেল। দ্বীপটার একেবারে কাছে পৌঁছে নৌকোটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বুড়ো মাঝি বললো, এবারে নামুন।

সেখানটায় অন্তত এক হাঁটু জল, তারপর কাদামাটি। বিমান বললো, আর একটু এগোও, এখানে নামবো কি করে?

বুড়ো মাঝিও এবার রাগে গড়গড়িয়ে বললে, আপনাদের বাবু এখানেই নামতে হবে। আমার নৌকো ঐ চরের মাটি ছোঁবে না। ও মাটি অপয়া।

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বললুম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা এখানেই নামবো।

জুতো খুলে রাখলুম নৌকোয়। তারপর হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নেমে পড়লুম জলে। ছপ-ছপ করে এগিয়ে গেলুম দ্বীপটার দিকে। বুড়ো মাঝি নৌকোটাকে আরো গভীর জলের দিকে নিয়ে গিয়ে ঝপাং করে নোঙর ফেলে দিল।

দ্বীপটাতে ছাড়া-ছাড়া গাছপালা রয়েছে। তারপর ধূ-ধূ করছে বালি। সেই বালিতে কোথাও কোথাও ঘাস হয়েছে। একটা খড়ের চালাঘরও রয়েছে এক পাশে। সেই ঘরে কিন্তু কোনো মানুষ নেই।

কাদামাখা পায়ে ওপরে উঠে আমরা বালিতে পা ঘষে নিলুম। বিমান বললো, একটা কিছু ফ্ল্যাগ সঙ্গে নিয়ে এলে হতো। তা হলে সেই ফ্ল্যাগটা পুঁতে আমরা এই দ্বীপটা দখল করে নিতুম!

আমি বললুম, তা কী করে হবে? আগেই তো এখানে মানুষ এসেছে। দেখছিস না, ঘর রয়েছে?

আমরা ঘরটার কাছে গিয়ে দেখলুম, তার মধ্যে পাতা আছে একটা খাটিয়া। আর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে শুকনো গোবর। জায়গাটায় বিচ্ছিরি গন্ধ।

বিমান বললো, এখানে লোকেরা গরু চড়াতে আসতো, কিন্তু গরুগুলোকে নিয়ে আসতো কী করে?

আমি বললুম, বড় বড় নৌকোয় করে নিয়ে আসতো। আমি নৌকোয় গরু-মোষ পার করতে দেখেছি।

—তারা এখন আর আসে না কেন?

—বর্ষাকাল এসে গেছে, সেইজন্য এখন আসে না। এ তো সোজা কথা।

—দ্বীপটা কী রকম চুপচাপ লক্ষ্য করছিস? কোনো শব্দ নেই।

—মানুষজন নেই, শব্দ হবে কী করে? তবু, আমি কিন্তু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কান পেতে শোন।

দু'জনেই চুপ করে দাঁড়ালুম। সত্যি খানিকটা দূরে গাছপালার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলছে খুব জোরে। কোনো মানুষ অবশ্য অত জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না।

বিমানের মুখটা শুকিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বললো, ওটা কিসের শব্দ বল তো, সুনীল? সাপ নাকি?

—সমুদ্রে বড় বড় অজগর সাপ থাকে শুনেছি। সমুদ্র থেকে যদি এখানে চলে আসে, ঐ জন্যই বোধহয় মাঝিরা এখানে আসতে ভয় পায়।

—একটা অজগর সাপ থাকলেও সেটাকে মেরে ফেলতে পারতো না? চল, এগিয়ে গিয়ে দেখি।

—সঙ্গে লাঠি-ফাটি কিছু একটা আনলে হতো।

—ভয় পাচ্ছিস কেন, বড় সাপ তো আর তাড়া করে এসে কামড়াতে পারে না।

ডান দিকে খানিকটা দূরে দু' তিনটে বড় গাছের পাশে কিছুটা জায়গা ঝোপঝাড়ের মতন। শব্দটা আসছে সেদিক থেকেই।

আমরা গুটিগুটি পায়ে এগোলুম সেদিকে। শব্দটা মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। কাছাকাছি গিয়ে আমিই ভয় পেয়ে বিমানের হাত চেপে ধরলুম। ঝোপের মধ্যে কী যেন বিশাল একটা জন্তু রয়েছে।

বিমান বললে, ওটা তো একটা মোষ। কাত হয়ে শুয়ে আছে।

এবারে আর একটু এগিয়ে আমরা মোষটার মাথাটা দেখতে পেলাম। দেখলেই বোঝা যায়, মোষটা মরে যাচ্ছে। মোষটার দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। ওরকম করুণ চোখ আমি কখনো দেখিনি। মোষটা মাঝে মাঝে

নিঃশ্বাস ফেলছে, তখন তার পেটটা ফুলে উঠছে। ঐ টুকুতেই বোঝা যায় যে ও বেঁচে আছে।

আমি বললুম, এতবড় একটা মোষ, কী হয়েছে ওর? সাপে কামড়েছে?

বিমান বললো, অসুস্থও হতে পারে। মোষেরাও অসুস্থ হয়।

—কিন্তু কোনো লোকজন নেই। একলা একলা একটা মোষ এখানে পড়ে আছে?

—মোষের মালিক বুঝতে পেরেছে, ও আর বাঁচবে না। সেইজন্য ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে।

আমরা আর ঝোপটার মধ্যে না ঢুকে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলুম। যতবার মোষটার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছি, ততবার মনটা খারাপ লাগছে।

বিমান বললো, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস, এখানে গাছের পাতাগুলো কেমন যেন শুকনো শুকনো। এখন বর্ষাকালে তো গাছে পাতা শুকিয়ে যায় না।

আমি বললুম, গাছগুলোর ছাল খসে পড়েছে অনেক জায়গায়। এখানে তো জল নোনা, তাই বোধহয় গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

বিমান বললো, বাজে কথা বকিস না। সুন্দরবনে অত গাছ রয়েছে না? সেখানকার জল তো আরও বেশি নোনা। এখানকার গাছগুলোর বোধহয় কিছু একটা রোগ হয়েছে। ওটা কী রে?

—ওটা তো একটা পাথর।

—আশ্চর্য তো! খুবই আশ্চর্য ব্যাপার!

—কিসের আশ্চর্য?

—তুই বুঝলি না? গঙ্গা নদীর দ্বীপে পাথর আসবে কী করে?

—কেন?

—এখানে কি কোথাও পাথর আছে? এদিকে কি কোথাও পাহাড় আছে? এখানে এতবড় একটা পাথর কে নিয়ে আসবে?

পাথরটা এমনিতেই খুবই সাধারণ। একটা মাঝারি ধরনের আলমারির সাইজের। যে-কোন পাহাড়ী জায়গায় গেলে এরকম পাথরের চাঁই পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু নদীর ওপরে একটা নতুন দ্বীপে ওরকম পাথর তো দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক নয়।

আমরা পাথরটার কাছে গেলুম। সেটার গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। আমি পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললুম, সমুদ্রের তলায় অনেক জায়গায় ডুবো পাহাড় থাকে। হয়তো গঙ্গার এখানটাতেও ডুবো পাহাড় আছে। দ্বীপটা তৈরী হবার সময় পাথরটা উঠে এসেছে।

বিমান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললো, তোর কী বুদ্ধি? পাথর কি হাল্কা জিনিস যে জলের উপরে ভেসে উঠবে? তা ছাড়া দ্যাখ, এর তলায় কিছু ঘাস চাপা পড়ে আছে। এই দ্বীপটা হবার পর কেউ পাথরটা এখানে এনেছে। কিন্তু শুধু শুধু এতবড় একটা পাথরকে এখানে বয়ে আনবে কেন?

আমি পাথরটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোত বললুম, উল্কা নয় তো! অনেক সময় উল্কার টুকরো পৃথিবীতে এসে পড়ে।

বলতে বলতে আমি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম।

বিমান দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কী হলো? কী হলো তোর?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলুম। আমিও অবাক হয়ে গেছি খুব। কী হলো কিছু বুঝতে পারছি না। এরকম তো আমার কখনো হয় না!

বিমান আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগলো, কী হলো রে, কী হলো?

আমি বললুম, জানি না। হঠাৎ কেমন মাথাটা ঘুরে গেল।

—চুপ করে বসে থাক, উঠিস না।

—আমার কিছু হয় নি।

—তবু বসে থাক। একটা জিনিষ দ্যাখ সুনীল, এই পাথরের নিচের ঘাসগুলো দ্যাখ, কেমন যেন খয়েরি হয়ে গেছে! ঘাস চাপা পড়লে হলদে হয়ে যায়, কিন্তু খয়েরি! তুই কখনো খয়েরি ঘাস দেখেছিস?

—এ বোধহয় অন্য জাতের ঘাস!

—পাশের এই গাছটা দ্যাখ। এই গাছটার গা-টা লাল। আমি লাল রঙের গাছও কখনো দেখি নি।

—বিমান, ঐ যে মোষটা মরে যাচ্ছে, ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে রে! এমনি এমনি একটা মোষ মরে যাচ্ছে, ইস্! মোষটাকে ওর মালিক যে ফেলে গেল।

—বিমান, আমার ইচ্ছে করছে এখানে শুয়ে পড়তে।

—মন্দ বলিস নি। এখানে খানিকক্ষণ শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিলে বেশ হয়।

—যদি নৌকোটা চলে যায়?

—ইস্! গেলেই হলো, পুরো পয়সা দিয়েছি না। তাছাড়া যদি যায় তো চলে যাক। আমরা এখানেই থেকে যাবো।

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠে পড়লুম। দারুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলুম, বিমান, বিমান, এই পাথরটা জ্যান্ত।

বিমান বললো, কী বলছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—না রে, আমি সত্যি দেখলুম, পাথরটা নড়ে উঠলো!

—কী বলছিস যা-তা! পাথরটা নড়বে কী করে?

—আমি স্পষ্ট দেখলুম, পাথরটার পেটের কাছে একবার যেন চুপসে গেল, আবার ফুলে উঠলো। ঠিক ব্যাঙের মতন।

—দূর! পাথরের আবার পেট কী? তুই ভুল দেখেছিস।

—মোটেই ভুল দেখিনি।

বিমান গিয়ে পাথরটার গায়ে হাত দিতেই আমি বিমানের অন্য হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনলুম ওকে। আমার বুকের মধ্যে দুম্-দুম্ আওয়াজ হচ্ছে। ঐ পাথরটার গায়ে হাত দিয়েই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। ঐ পাথরটার কিছু একটা ব্যাপার আছে!

দূরে শুনতে পেলুম, বুড়ো মাঝি আর সুলেমান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে, বাবু! বাবু!

আমি বললুম, চল বিমান, নৌকোয় ফিরে যাই।

বিমান বললো, নাঃ, এক্ষুনি যাবো না। এখানে শুয়ে থাকবো বললুম যে।

—না, আমার মোটেই ভালো লাগছে না। চল, নৌকোয় ফিরে যাই।

বিমানকে প্রায় জোর করেই আমি টানতে টানতে নিয়ে চললুম। তারপর নৌকায় উঠেই বুড়ো মাঝিকে বললুম, চলো শিগগির চলো।

নৌকায় উঠে বিমান লম্বা হয়ে শুয়ে রইলো। তার চোখদুটো ছলছল করছে। ভাঙা গলায় বললো, আমার কিছুই ভালো লাগছে না রে!

সুলেমান আমাদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, ঐ দ্বীপে গেলে তোমাদের কী হয় বলো তো?

সুলেমান বললো, কী জানি, বাবু! ওখানে গেলেই মনটা যেন কেমন কেমন করে। কাজ করতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

বুড়ো মাঝি বললো, বাবু, আগে তো আমরা ঐখানে চলে যেতাম। বেশি ঝড়-বৃষ্টি হলে ওখানে নৌকো বেঁধে চালা ঘরটায় বসে জিরোতাম। অনেক লোক আগে ওখানে গরু-মোষ চরাতে আসতো। এখন আর কেউ যায় না।

—কেন যায় না বলো তো?

—ওখানে গেলেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গরু-মোষগুলোও আলসে হয়ে পড়ে। কেমন যেন মনমরা লাগে!

—আমাদেরও সেই রকম লাগছিল। কিন্তু কেন হয় ওরকম বলো তো?

—কী জানি! গাছপালাগুলোও কেমন ধারা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখলেন না? ও দ্বীপে খারাপ নজর লেগেছে।

—ওখানে একটা বড় পাথর আছে দেখেছো! আগে ওটা ছিল?

—না, আগে ছিল না। এই তো মাসখানেক ধরে দেখছি।

—কী করে পাথরটা ওখানে এলো?

—কেউ তা জানে না। কেউ কেউ বলে, ওটা আকাশ থেকে খসে পড়েছে।

আমার মাথাটা এখনও দুর্বল লাগছে। আমি আর কথা বলতে পারলুম না। শুয়ে পড়লুম বিমানের পাশে।

হলদিয়ায় ফিরে এসে আমরা দু'জনেই সোজা চলে গেলুম বিছানায়। রাত্তিরে কিছু খেতেও ইচ্ছে করলো না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। তার মধ্যে বারবারই দেখতে লাগলাম সেই পাথরটাকে। ঠিক একটা ব্যাঙের মতো। তার পেটটা একবার চুপসে যাচ্ছে, একবার ফুলছে। একটা জ্যান্ত পাথর। আমি শিউরে শিউরে উঠতে লাগলাম।

সকালবেলা বিমানের দাদা, স্বপনদা জিজ্ঞেস করলেন, তোদের কাল কী হয়েছিল? সন্ধ্যে থেকে খালি ঘুমোচ্ছিলি?

স্বপনদাকে সব কথা বলতেই হলো। স্বপনদা সবটা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে বললো, গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাস নি। একটা জ্যান্ত পাথর...সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মন খারাপ হয়ে যায়, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। দূর! যতসব!

বিমান বললো, দাদা, আমি পাথরটাকে নড়তে দেখিনি, সুনীল দেখেছে। কিন্তু আমারও ওখানে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

—বেশ করছিল। শুয়ে থাকলেই পারতিস।

—তাহলে আমাদেরও নিশ্চয়ই ঐ মোষটার মতন অবস্থা হতো।

আমি বললুম, স্বপনদা, নৌকোর মাঝিরাও কেউ ঐ দ্বীপটায় এখন যেতে চায় না। ওরাও ভয় পায়। পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।

স্বপনদা বললেন, পুলিশও তোদের কথা শুনে আমার মতন হাসবে। দেখবি, মিঃ দাসকে ডাকবো?

হলদিয়ার এস. ডি. পি. ও. মিঃ স্বপনদার বন্ধু। স্বপনদা তাঁকে টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন। বললেন, মিঃ দাস, একবার আমার বাড়ীতে চলে আসুন, ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবেন, আর একটা মজার গল্প শোনাবো!

দশ মিনিটের মধ্যেই মিঃ দাস এসে গেলেন। তিনি বললেন, শুধু এককাপ চা খাবো। বড্ড কাজ পড়েছে, এক্ষুনি যেতে হবে। কাল রাত্তিরে একটা লঞ্চডুবি হয়েছে গঙ্গায়।

স্বপনদা বললেন, বসুন, বসুন! কাল দুপুরে এই দুই শ্রীমান নৌকো ভাড়া করে গিয়েছিল আগুনমারির চরে। সেখানে নাকি ওদের এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওরা দু'জনে...

স্বপনদাকে থামিয়ে দিয়ে পুলিশ সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা দু'জনে কাল আগুনমারির চরে গিয়েছিলে? আশ্চর্য ব্যাপার! ঐ দ্বীপটার পাশেই তো কাল রাত্তিরে লঞ্চটা ডুবেছে। ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই। শুধু শুধু একটা লঞ্চ ডুবে যাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

স্বপনদা জিজ্ঞেস করলেন, কেউ মারা গেছে?

পুলিশ সাহেব বললেন, না, মরে নি কেউ। সবাইকে উদ্ধার করা গেছে। আমাদের পুলিশের লঞ্চ খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়। কিন্তু লঞ্চটা যে কী করে ডুবলো, তা ওরা কেউ ঠিক ঠিক বলতে পারছে না। সবাই বলছে, কী যেন হলো কিছুই জানি না, হঠাৎ একটা ধাক্কাতে লঞ্চটা কেঁপে উঠলো, তারপরই হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকতে লাগলো।

স্বপনদা বললেন, লঞ্চটা একদম ডুবে গেছে বলতে চান?

পুলিশ সাহেব বললেন, হ্যাঁ। সেটা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ লঞ্চের একজন খালাসী শুধু অদ্ভুত একটা গল্প বলছে। আগুনমারির চড় থেকে একটা মস্ত পাথর নাকি উড়ে এসে প্রচণ্ড জোরে লঞ্চটাকে ফুটো করে দেয়।

এমন গাঁজাখুরি কথা কেউ শুনেছে? গঙ্গার ওপরে দ্বীপ। সেখানে পাথর আসবে কী করে? যদি-বা পাথর থাকতে, সেটা কেউ না ছুঁড়লে এমনি এমনি উড়তে উড়তে আসবেই বা কী করে?

স্বপনদা বললেন, এরাও ঐ দ্বীপে একটা বড় পাথর দেখেছে বলছে।

পুলিশ সাহেব বললেন, ভোরবেলা আমি আমাদের লঞ্চে সেই দ্বীপটা ঘুরে দেখে এসেছি। সেখানে পাথর-টাথর কিছু নেই। মানুষজনদের কোনো চিহ্ন নেই। একটা মরা মোষ রয়েছে দেখলুম।

আমি আর বিমান চোখাচোখি করলুম। আগুনমারির চরের পাথরটাই যে লঞ্চটাকে ডুবিয়েছে, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই!

আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন। তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

জ্যান্ত খেলনা

বারান্দায় বসে গল্প করছিল সবাই, এমন সময় দীপু ছুটতে ছুটতে সেখানে এলো। তার হাতে একটা শুকনো গাছের ডাল। দীপুর মুখ-চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। সে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে একটা নতুন কিছু।

শুকনো ডালটা উঁচু করে তুলে সে চেঁচিয়ে বললো, মা, দেখো কি সুন্দর একটা জিনিস পেয়েছি।!

বড়রা গল্প থামিয়ে তাকালো দীপুর দিকে। তার হাতে শুধুই একটা শুকনো গাছের ডাল। সুন্দর কিছু না।

মা বললেন, দীপু, তুই আবার একলা একলা বাগানে গিয়েছিলি?

বাবা বললেন, সেই জন্যই অনেকক্ষণ দীপুকে দেখতে পাইনি!

বাড়ীর পেছনেই বেশ বড় বাগান। বাগান মানে অবশ্য শুধু ফুল গাছের বাগান নয়। বড় আম গাছ আর নারকেল গাছে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। আরও অনেক রকম গাছ আছে। কেউ যত্ন করে না। আগাছা জন্মে গেছে মাটিতে। বাগানের মধ্যে একটা পুকুরও আছে, সেটাও কচুরি পানায় ভর্তি।

দীপুর বড় মামাদের এই গ্রামের বাড়ীতে এখন আর বিশেষ কেউ থাকে না। এবার দীপুরা সবাই বেড়াতে এসেছে।

বড় মামা বললেন, ও বাগানে খেলুক না। ভয় তো কিছু নেই।

মা বললেন, যদি সাপ-টাপ থাকে।

বড় মামা বললেন, তোর কি বুদ্ধি! শীতকালে বুঝি সাপ বেরোয়?

মা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বললেন, তা হোক, এই দুপুর বেলা বাগানে একলা একলা থাকা ভালো নয়। একটা পুকুর আছে যদি পড়ে টড়ে যায়।

দীপু তাড়াতাড়ি বললো, না, আমি পুকুরের কাছে যাইনি। বাবার বন্ধু অমলকাকু এক পাশে বসে চুরুট টানছিলেন। তিনি বললেন, দীপু, তুমি কি সুন্দর জিনিস এনেছো?

দীপু গাছের ডালটা এগিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন অমলকাকু, এটা খুব সুন্দর না? আমি আগে আর এরকম একটাও পাইনি!

বাবা বললেন, এটার মধ্যে আবার সুন্দর কি আছে?

প্রায় এক হাত লম্বা একটা আম গাছের ডাল। ওপরের দিকে কয়েকটা শুকনো পাতা তখনো আছে, মাঝখান দিয়ে আবার দুটো শুকনো ডাল দু'দিকে বেরিয়েছে।

দীপু বললো, দেখুন, দেখুন, এটা ঠিক মানুষের মতন দেখতে না?

অমলকাকু বললেন, তাই নাকি!

দীপু জোর দিয়ে বলো, দেখতে পাচ্ছেন না, অবিকল ছোট মামার মতন!

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো একসঙ্গে। শুধু দীপুর ছোট মামা হাসতে পারলেন না। ছোট মামার চেহারাটা রোগা আর লম্বা, মাঝে মাঝে ওপরের দিকে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙেন। তাঁর চেহারা সম্পর্কে কেউ ঠাট্টা করলে তিনি রেগে যান।

অমলকাকু হাসতে হাসতে বললেন, ঠিকই বলেছে কিন্তু! এ ছেলে দেখছি বড় হলে নির্ঘাত আর্টিস্ট হবে।

মা বললেন, আর্টিস্ট হবে না ছাই। এই এক অদ্ভুত খেলা আছে ছেলেটার!

অমলকাকু ছোট মামাকে আরও রাগাবার জন্যে বললেন, কিন্তু যাই বলো তোমরা, আমি কিন্তু খুব মিল দেখতে পাচ্ছি।

ছোট মামা মনের ভুলে ঠিক সেই সময়েই আড়মোড়া ভাঙার জন্য হাত দুটো উঁচু করলেন। সবাই হেসে উঠলো আবার।

দীপু বললো, মা, আমি কিন্তু এটা নিয়ে যাবো বাড়ীতে।

আর কিছু না বলে দীপু লাফাতে লাফাতে চলে গেল তার ঘরের দিকে।

মা বললেন, ছেলেটা যত রাজ্যের জঞ্জাল এনে জমাচ্ছে ঘরে। এ সব নাকি আবার নিয়ে যেতে হবে।

বাবা বললেন, কালকে একটা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে এনে বলছিল সেটাকে নাকি দেখতে একেবারে জগন্নাথের মতন।

অমলকাকু বললেন, ভুল তো বলেনি তাহলে। দারু ভূতে মুরারি।

মা বললেন, কেন, সেই যে আর একটা কঞ্চি এনে একবার বলেছিল সেটা ওর ঠাকুমা।

এইসব গল্প করতে করতে বড়রা আবার বড়দের গল্পে ফিরে গেলেন।

আর কোনো ছোট ছেলে মেয়ে নেই বলে এখানে দীপুকে খেলা করতে হয় একলা একলা। মা বারণ করলেও সে টুকটুক করে লুকিয়ে চলে যায় বাগানে। সে যে পুকুরটার কাছে নেমে একবার জলে পা দিয়ে এসেছে, মা সে কথাও জানেন না।

বাগানটা খুব ঠাণ্ডা। এতসব বড় বড় গাছ, তাদের ডালে পাতায় হাওয়া লেগে লেগে কত রকম সব মিষ্টি মিষ্টি শব্দ হয়। দীপুর মনে হয়, গাছগুলো যেন বেশ মানুষ, সবাই তাকে দেখছে। পাতা দুলিয়ে দুলিয়ে কি যেন কথা বলতে চাইছে তার সঙ্গে। অনেক রকম পাখিও আছে এখানে। পাখিদের সঙ্গে গাছেদের খুব ভাব, কক্ষনো ওরা ঝগড়া করে না। পাখিগুলো সব সময় ব্যস্ত। হয় ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ছে কিংবা বসে বসে ডাকছে। একটা পাখি অনেকক্ষণ ধরে কুং কুং কুং করে ডাকে, সেটাকে কিছুতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

সবচেয়ে বড় আম গাছটার নীচে দুটো ছোট্ট গাছ। দীপুরই সমান লম্বা। দীপু ওদের নাম দিয়েছে অরিজিৎ আর সুমন্ত্র। ঐ নামে দীপুর ইস্কুলের দু'জন বন্ধু আছে। গাছ দুটোকে দীপু ঐ নাম দিয়ে ওদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে খেলা করে।

দীপু বলে, জানিস ভাই, আমি টিনটিনের বইগুলো আনতে ভুলে গেছি। তোরা কি টিনটিনের নতুন বই পেয়েছিস? আমাকে দিবি তো?

গাছগুলো হাওয়ায় দোলে। ঠিক যেন মাথা নাড়াচ্ছে।

দীপু আবার বলে, কাল রাত্তিরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, তখন শুনলুম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে বাইরে। আমি মাকে ডাকিনি, বাবাকেও ডাকিনি। ভাবলুম কি, নিজেই একলা একলা বাইরে গিয়ে দেখবো। একটুও ভয় পাইনি, সত্যি! যেই খাট থেকে নেমেছি, অমনি শব্দটা থেমে গেল। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, একটা বেড়াল। আমাকে দেখেই পালালো। ওটা কিন্তু আসলে বেড়াল নয়। নিশ্চয়ই মিশমিদের সর্দার এসেছিল, সেই যে, যে ইচ্ছে করলেই অন্যরকম চেহারা নিতে পারে—আমাকে দেখেই বেড়াল হয়ে গেল, বুঝলি?

এই রকম গল্প করতে করতেই দীপুর সময়টা কেটে যায়। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রজাপতি এসে বসে সেই ছোট গাছ দুটোতে। তখন দীপু কথা থামিয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকে। একটা প্রজাপতির নাম সে দিয়েছে 'বুবাই'। ওটা ওর মাসতুতো বোনের নাম।

একবার দীপু দেখলো, অরিজিৎ নামের গাছটার গা বেয়ে বেয়ে একটা শুঁয়োপোকা উঠছে। দীপু খুব রেগে গেল সেটা দেখে। সে ধমক দিয়ে বললো, এই, তুমি আমার বন্ধুর গায়ে উঠছো কেন? শিগগির নামো।

শুঁয়োপোকাটা এমন পাজি যে কোনো কথাই শোনে না।

দীপু তখন একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দেয়। শুঁয়োপোকাটার নাম দেয় সে কুম্ভকর্ণ, তারপর অনেকক্ষণ ধরে সেটার সঙ্গে লড়াই করে। সেটাকে হারিয়ে দিয়ে দীপু আবার বাড়ীতে ফিরে আসে মাকে খবরটা জানাবার জন্য।

দীপুর মামারবাড়ীর গ্রামের খুব কাছেই বক্রেশ্বর। সেখানে গরম জলের ফোয়ারা আছে। পরের দিন সবাই সেখানে বেড়াতে যাবে। দীপু যেতে চায় না। তার বেশী ভালো লাগে ঐ বাগানে খেলা করতে। কিন্তু দীপুকে একা রেখে যেতে মা রাজি হলেন না। দীপুকে যেতেই হলো। গিয়ে অবশ্য একটা লাভ হলো। সেখানে দীপু একটা পাথরের টুকরো পেয়ে গেল, সেটাকে দেখতে একদম সুতপা মাসীর মতন। ঠিক সেই রকম হাসি হাসি মুখ। পাথরটা সঙ্গে করে নিয়ে এলো দীপু।

সাতদিন কেটে যাবার পর, এবার কলকাতায় ফিরতে হবে। বাবার অফিসের আর ছুটি নেই। ফেরা হবে বড় মামার গাড়িতে। মালপত্তরে

একেবারে বোঝাই হয়ে গেছে গাড়ি। সবাই এক বস্তা করে নারকেল নিয়েছে। তার ওপরে আবার ঝুড়ি ঝুড়ি পাটালি গুড়। এর ওপর আছে আবার দীপুর নিজের জিনিস। সাতটা গাছের ডাল, তিনটে কঞ্চি আর চারখানা পাথরের টুকরো। বড়দের সব জিনিসপত্তর ঠিক ঠিক তোলা হলো, শুধু দীপুর জিনিসগুলো নেবার বেলাতেই গাড়িতে জায়গা কম পড়ে যায়।

বাবা বললেন, এইসব আজে বাজে জিনিসগুলো নিয়ে কি করবি? ওগুলো ফেলে দে।

দীপু কিছুতেই রাজি নয়। এগুলো তার খেলার জিনিস, সে কিছুতেই ফেলে যাবে না।

দীপু প্রায় কেঁদে ফেলছে দেখে মা বললেন, যাক্‌গে, নিতে চাইছে যখন নিয়ে যাক।

গাছের ডালগুলো রাখা হলো গাড়ির মাথায় ক্যারিয়ারে, বিছানা-পত্তরের পাশে। পাথরগুলো দীপু নিজের পায়ের কাছে রাখলো।

দীপুর ছোটমামা শুধু থেকে গেলেন, তিনি আর ক'দিন পরে একা ফিরবেন। আর সবাই উঠে পড়লো গাড়িতে। অমলকাকু বসেছেন দীপুর ঠিক পাশেই। পাথরগুলোতে পা লাগায় অমলকাকু জিজ্ঞেস করলেন, এই পাথরগুলো নিয়ে গিয়ে কি হবে দীপু? এরকম পাথর তো সব জায়গাতেই পাওয়া যায়।

দীপু বললো, না মোটেই না। এই দেখুন না, এই পাথরটাকে দেখতে ঠিক ক্যাপটেন হ্যাডকের মতন।

অমলকাকু জিজ্ঞেস করলেন, ক্যাপটেন হ্যাডক কে?

দীপু বললো, সে আছে একজন আমার গল্পের বইতে।

অমলকাকু আর একটা পাথর তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর এইটা?

—এটা তো সুতপা মাসী।

—তাই নাকি? তাহলে ওটা?

দীপু মুচকি হেসে বললো, অমলকাকু, আপনার মতন দেখতেও একটা পাথর পেয়েছি!

অমলকাকু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, তাই নাকি? কই, দেখি দেখি!

দীপু একটা বিশ্রী দেখতে পাথর তুলে দিল। অমলকাকু হাসতে হাসতে বললেন, আরে, তাই তো, এটা তো ঠিক আমার মতন অবিকল দেখতে!

সবাই দারুণ হাসতে লাগলো। বড় মামা গাড়ি চালাতে চালাতে এমন হাসতে লাগলেন যে আর একটু হলে গাড়িটা রাস্তার পাশে গড়িয়ে যেত। কেউই কিন্তু পাথরটার সঙ্গে অমলকাকুর মুখের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না।

বাবা বললেন, ছেলেটা একেবারে পাগল। কি যে ওর খেলা!

অমলকাকু বললেন, না, না, পাগল কেন হবে? আর্টিস্ট এরকম অনেক কিছু দেখতে পায়, আমরা সাধারণ লোকরা তা পাই না।

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর অমলকাকুর চা খেতে ইচ্ছে হলো। গাড়ি থামানো হলো সেইজন্য। চায়ের দোকানের কাছে সবাই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। অন্যদের হাতে চায়ের কাপ, দীপু নিয়েছে বোতলের সরবৎ।

সেখানে একজন মেয়ে কতকগুলো বড় বড় রং করা বেতের ঝুড়ি বিক্রি করছিল। অমনি মায়ের একটা পছন্দ হয়ে গেল। যে-কোনো জায়গা থেকে জিনিস কেনা মায়ের স্বভাব।

কিন্তু অতবড় ঝুড়িটা নেওয়া হবে কোথায়? গাড়ির মাথাতেই বেঁধে নিতে হবে। বাবা আর অমলকাকু সেটা বাঁধাবাঁধি করছেন, হঠাৎ দীপু চীৎকার করে ছুটে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, একি, কি করলে? ছোট মামার হাতটা যে ভেঙে গেল!

সবাই অবাক হয়ে থমকে গেল। চায়ের দোকানের লোকগুলো পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকিয়েছে।

তারপরই বোঝা গেল ব্যাপারটা। ঝুড়িটা রাখতে গিয়ে ঠেলাঠেলিতে দীপুর একটা গাছের ডাল খানিকটা ভেঙে গেছে।

বাবা আর অমলকাকু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসছিলেন, কিন্তু দীপু কাঁদতে লাগলো। কেন তার খেলনা ভেঙে দেওয়া হলো! অমলকাকু বললেন, ঠিক আছে, রাস্তায় যেতে যেতে আর একটা ডাল কুড়িয়ে নিলেই তো হবে। কিন্তু দীপু সে কথা শোনে না। সে তো যে-কোনো গাছের ডাল নেয় না। এই ডালটা ঠিক ছোটমামার মতন ছিল, এটার কেন হাত ভাঙলো, ঠিক এই রকম একটা আবার তার চাই।

বাবা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি তো বড্ড বিরক্ত করছো। ঐ রকম করলে সব কটা ফেলে দেবো। যাও চুপ করে গাড়িতে বসে থাকো।

দীপু গাড়িতে গিয়ে মুখ নীচু করে বসে রইলো। সারাটা রাস্তা আর কারুর সঙ্গে কথা বললো না।

কলকাতায় ফিরে আবার সব ঠিক হয়ে গেল। দীপু তার খেলনাগুলো সাজিয়ে রেখেছে নিজের ঘরে। তার স্কুল খুলতে এখনো কয়েকদিন দেরি আছে। খেলনার গাছের ডাল, পাথর, রাংতা কাগজ কিংবা পাখির পালক— এই সবকিছুই যেন তার চোখে জ্যান্ত। সে প্রত্যেককে একটা কিছু নাম দিয়ে এদের সঙ্গে কথা বলে। এদের মধ্যে আছে নানান চেনাশুনো আত্মীয় স্বজন, স্কুলের বন্ধু, জগন্নাথ, নেপোলিয়ান, ক্যাপ্টেন হ্যাডক, অরণ্যদেব, ভীম, অর্জুন, এইসব। দীপু অনেক সময় আপন মনে এদের সঙ্গে এত জোরে জোরে কথা বলে যে পাশের ঘর থেকে মা পর্যন্ত চমকে ওঠেন।

দুপুরবেলা মা শুনতে পেলেন, দীপু বলছে, বাবা, তুমি সিগারেট খাবে? দেশলাই এনে দেবে।

দীপু যেন সত্যিই তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে। মা চমকে উঠে এ ঘরে এসে বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস? তোর বাবা কোথায়? অফিস থেকে ফিরেছে নাকি?

দীপু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ঐ তো বাবা!

মা দেখলেন, একটা পুরোনো ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের জালের ফাঁকে কাগজ পাকিয়ে সিগারেটের মতন আটকে রেখেছে দীপু। সেটাকেই বাবা বলছে।

মা আজ আর রাগ করলেন না, হাসলেন। তারপর বললেন, তোকে নিয়ে আর পারি না। আচ্ছা, তোর আর কোন্ কোন্ খেলনা কার মতন দেখতে শুনি তো।

দীপু পর পর সব কটা শুনিয়ে গেল। এমনকি সেই ভাঙা ডালটাও সে এখনো ফেলেনি। মা সবচেয়ে বেশী হাসলেন একটা কালো পাথরের নাম সুতপা মাসী শুনে। সুতপা মাসীর গায়ের রং দারুণ ফর্সা।

তারপর মা জিজ্ঞেস করলেন, আমার মতন দেখতে কোনটা রে? আমি কোনটা?

দীপু মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার মতন দেখতে একটাও পাই নি মা। কত খুঁজেছি, তবুও পাই নি।

সেদিন বিকেলবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরে গম্ভীরভাবে মাকে বললেন, তোমার দাদা ফোন করেছিলেন, একটা খারাপ খবর আছে।

মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর? কি হয়েছে?

বাবা বললেন, অনন্তপুর থেকে খবর এসেছে, কেষ্টর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

অনন্তপুর গ্রামেই দীপুরা বেড়াতে গিয়েছিল। আর কেষ্ট হচ্ছে ছোটমামার ডাক নাম। তিনিই ঐ গ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন।

মা চোখ-মুখে ভয় ফুটিয়ে বললেন, কি হয়েছে কেষ্টর?

বাবা বললেন, কেষ্ট গাছ থেকে পড়ে গেছে। ঐ রোগা চেহারা নিয়ে কেষ্ট জোর করে একটা নারকেল গাছে উঠেছিল। নারকেল গাছে কি আর যে-সে উঠতে পারে। অনেক উঁচু থেকে পড়ে গেছে শুনলাম।

—কোথায় লেগেছে?

—খুব জোর বেঁচে গেছে। মাথায় কিছু হয়নি! কিন্তু একটা হাতে খুব জোর চোট লেগেছে। কালকেই নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়।

তারপর এই নিয়ে অনেক কথা হলো। মা সারা সন্ধ্যে চিন্তা করতে লাগলেন তাঁর ভাই সম্পর্কে। শুধু চিন্তা নয়, তাঁর মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে রইলো। কি রকম যেন একটা অস্বস্তি।

মা এসে একবার দীপুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দীপু তখনও একমনে কথা বলে যাচ্ছে তার খেলনাদের সঙ্গে। সে তখন কর্ণ সেজে যুদ্ধ করছে অর্জুনের সঙ্গে। মা দূর থেকে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ দেখলেন। কিছু একটা বলি বলি করেও বললেন না। একবার তাকালেন সেই ভাঙা ডালটার দিকে। তাঁর ভুরু কুঁচকে রইলো অনেকক্ষণ।

এর তিনদিন বাদে দীপু স্নান করছে দুপুরবেলা, মা রান্না ঘরে, বাড়ীর ঝি ঘর-দোর সব মুছচে, এমন সময় দীপুর পড়ার ঘর থেকে দড়াম করে একটা শব্দ হলো।

বাথরুম থেকেই সেই শব্দ শুনতে পেয়ে দীপু চেঁচিয়ে উঠলো, কি হলো? কি ভাঙলো?

কোনো উত্তর না পেয়ে দীপু ভিজে গায়েই ছুটে এলো নিজের ঘরে। এসে দেখলো, বাড়ীর ঝি দু'টুকরো ভাঙা পাথর হাতে নিয়ে বোকার মতন দাঁড়িয়ে আছে।

দীপু চিৎকার করে বললো, রাধামাসী, তুমি আমার খেলনা ভেঙে ফেললে?

রাধামাসী বললো, কি জানি বাবা! মা বললেন ঘরটা মুছে দিতে। এই পাথরটা মেঝে থেকে টেবিলের ওপর তুলে রাখতে যাচ্ছিলাম, আপনি আপনি কি রকম পড়ে ভেঙে গেল।

দীপু কান্না মেশানো অভিযোগের সঙ্গে বললো, আপনি আপনি আবার কিছু পড়ে যায় নাকি!

মা রান্নাঘর থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

দীপু বললো, দ্যাখো না মা! ঠাকুমাকে দু'টুকরো করে দিয়েছে!

মা একটু কেঁপে উঠলেন। তারপর বললেন, এসব আবার কি অলুক্ষণে কথা! চুপ কর।

দীপু তবু বললো, তোমরা কেন আমার সব খেলনা ভেঙে দেবে?

মা হঠাৎ রাধামাসীকে খুব বকতে লাগলেন। একটু দেখেশুনে কাজ করতে পারো না? সব সময়ই তো এটা ভাঙছো সেটা ভাঙছো।

রাধা মাসী গজগজ করে উঠে বললো, একটা সামান্য পাথর, তাও আপনা আপনি পড়ে গেল টেবিল থেকে—তাতেও আমার দোষ বলো।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা এলাহাবাদ থেকে টেলিগ্রাম এলো। দীপুর ঠাকুমা হঠাৎ মারা গেছেন।

এলাহাবাদে দীপুর জ্যাঠামশাইরা থাকেন। ঠাকুমাও কয়েকমাস আগে সেখানে গিয়েছিলেন।

টেলিগ্রামটা পেয়ে বাবা ধপ করে বসে পড়লেন। কান্না-কান্না গলায় বললেন, সামনের সপ্তাহেই মাকে নিয়ে আসবো ভেবেছিলাম। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হলো না!

এই সময় মা এত জোরে কেঁদে উঠলেন যে বাবা পর্যন্ত চমকে উঠলেন। তারপর বাবা উঠে এসে মায়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি অত ভেঙে পড়ো না। আমার বাক্স গুছিয়ে দাও। আমি আজই রাত্রের ট্রেনে এলাহাবাদ রওনা হবো!

মা বাবার হাত চেপে ধরে বললেন, আমার ভয় করছে! আমার ভীষণ ভয় করছে।

বাবা বললেন, ভয় কি? কয়েকটা দিন তুমি একা থাকতে পারবে না?

মা বললেন, সে জন্য না। তোমার মনে আছে, দীপুর খেলনা সেই গাছের ডালটা যখন ভেঙেছিল, তখন দীপু কি বলেছিল?

—কি বলেছিল?

—তোমার মনে নেই? দীপু বলেছিল, ছোটমামার হাত ভেঙে গেল যে! তারপর সত্যি সত্যি কেষ্টর হাত ভাঙলো। তারপর আজই দুপুরে, ও যে খেলনাটাকে ঠাকুমা বলে, সেটাকে ঝি ভেঙে দিয়েছে।

বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু'এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, যাঃ, এসব কি বলছো! এ আবার হয় নাকি!

মা ব্যাকুলভাবে বললেন, সত্যি যে মিলে যাচ্চে!

বাবা বললেন, মিললেই বা কি হয়েছে! একে বলে কাকতালীয়। এই থেকেই মানুষের কুসংস্কার জন্মায়।

বাবা চলে গেলেন এলাহাবাদ। এই ক'দিন মা দীপুকে সব সময় চোখে চোখে রাখলেন। তাকে আর বেশী খেলতে দেন না। সব সময় নিজের কাছে এনে জোর করে পড়তে বসান।

বাবা এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন ক'দিন বাদেই। মাথা ন্যাড়া করেছেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন আরও কয়েকদিন। দুপুরবেলা বাড়ীতেই থাকেন। দীপুর ইস্কুল খুলে গেছে।

বাবা ঠাকুমার একটা ছবি বাঁধিয়ে এনেছেন সেদিন সকালে। ছবিটা তাঁর শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙাবেন। পেরেক ঠোকার জন্য একটা শক্ত কিছু দরকার। বাড়ীতে হাতুড়ি টাতুড়ি নেই। বাবা এ ঘর সে ঘর খুঁজতে খুঁজতে দীপুর পড়ার ঘর থেকে একটা বড় পাথর পেয়ে গেলেন। এটাতেই কাজ চলবে।

বাবা পেরেকটা ঠুকছেন, এমন সময় মা দৌড়ে এসে বললেন, একি তুমি একি করছো! ওটা রেখে দাও।

বাবা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কেন কি হয়েছে?

—তুমি দীপুর খেলনা নিয়েছো?

—তাতে কি হয়েছে? পাথর দিয়ে পেরেক ঠুকতে পারবো না।

—ও খুব ভালোবাসে খেলনাগুলো। এটা যে ওর অমলকাকু! পেরেকটা তখন ঠোকা হয়ে গেছে। বাবা বললেন, ঠিক আছে, আমি রেখে দিচ্ছি। আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিলেই তো হলো। পাথর তো আর ক্ষয়ে যায়নি।

মা বাবার হাত থেকে পাথরটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, এই দ্যাখো, মাঝখানটা কি রকম খুবলে গেছে!

বাবা বললেন, মাঝখানটায় একটা চলটা উঠে গেছে শুধু। ও দীপু কিছু বুঝতে পারবে না। যাও পাথরটা রেখে এসো।

মা তবু সেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অনেকদিন অমলের কোনো খবর নেই। এ বাড়ীতেও আসে নি।

বাবা বললেন, হুঁ, বেশ কিছুদিন অমলের পাত্তা নেই বটে। আমিও এলাহাবাদে ছিলাম। এসেও খোঁজ নেওয়া হয়নি!

মা বললেন, তুমি এক্ষুনি ফোন করো!

মায়ের গলার আওয়াজটা এমনই অন্যরকম যে বাবা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ফোন তুললেন।

—হ্যালো, অমল?

—কে, প্রশান্ত? কি খবর?

—তোর খবর কি? অনেকদিন পাত্তা নেই।

—ক'দিন খুব সর্দি কাশী আর জ্বরে ভুগছিলাম।

—এখন ভালো আছিস?

অমলকাকু সব কথাতেই হাসেন। এবারেও হাসতে হাসতে বললেন, আজ এক্স-রে রিপোর্ট পেলাম। বুকটা একটু জখম হয়েছে ভাই। ডাক্তার বলছে, আমার প্লুরিসি হয়েছে।

মা আর বাবা দু'জনেই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাঁ!

টেলিফোন রেখে দিয়েই বাবা একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। অমলকাকু তাঁর খুবই প্রিয় বন্ধু। মা তখনও সেই বুকের কাছে চলটা-ওঠা পাথরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

বাবা বললেন, তোমার ছেলের এই সাংঘাতিক খেলা বন্ধ করতেই হবে।

মা বললেন, দীপুর দোষ কি? আমরাই তো ওর খেলনাগুলো ভেঙে দিই কিংবা নষ্ট করি।

বাবা বললেন, তা বলে জ্যান্ত মানুষের নাম নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা। একটার পর একটা বিপদ ঘটে যাচ্ছে।

বাবা রেগে গেলে আর কারুর কথা শোনেন না! দীপুর ঘরে ঢুকে তিনি

সব পাথরের টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন পেছনের মাঠে। গাছের ডাল, কঞ্চি ভাঙা, ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট এগুলোও ফেলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মত বদলে বললেন, এগুলো সব আমি আগুনে পুড়িয়ে দেবো।

দীপু তখন ইস্কুলে, তার সব খেলনা শেষ হয়ে যেতে লাগলো। বাবা তার সব গাছের ডাল আর কঞ্চিগুলো গুঁজে দিতে লাগলেন রান্না ঘরে জ্বলন্ত কয়লার উনুনে।

ভাঙা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটাও যখন উনুনে দিতে যাচ্ছেন, তখন মা তাঁর হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন, ওটা দিও না, ওটা থাক, ওটা দিও না।

বাবা সেকথা শুনলেন না। জোর করে র‍্যাকেটটা ভরে দিলেন উনুনে।

তখুনি উনুন থেকে একটা আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠলো। আগুনের জিভ ছুঁয়ে দিল বাবার পাঞ্জাবীর হাতা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। মা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কোনোক্রমে তিনি উনুন থেকে টেনে তুললেন র‍্যাকেটটা।

আগুন বেশী ছড়ায় নি। বাবার হাতটা শুধু একটু ঝলসে গিয়েছিল, বেশী কিছু হয়নি, মলম লাগাতেই সেরে গেছে।

বাবা দীপুর জন্য অনেকগুলো পুতুল ও মূর্তি কিনে দিয়েছেন। যেমন, বিবেকানন্দ, নেপোলিয়ান, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, সৈন্য, নাবিক, শিকারী, রবীন্দ্রনাথ, শিবাজী এইসব—অর্থাৎ যাঁরা কেউ এখন বেঁচে নেই।

পানিমুড়ার কবলে

আমাদের বাড়ীর পেছনে একটা বড় পুকুরের ওপাশে একটু একটু জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবরখানা। তারপর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল।

সে বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেল আলিপুর-দুয়ারে। আমাদের বাড়ী পাওয়া গেল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হলো বলে এখানকার স্কুলে আমি ভর্তি হতে পারলাম না। নতুন বছরে ভর্তি হতে হবে।

তাই দুপুরবেলা আমার কিছুই করার থাকে না। বাবা অফিস চলে যান, মা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছে করে না দুপুরে। একটাও নতুন গল্পের বই নেই, আর পড়ার বই তো বেশীক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে। তাই আমি চুপি চুপি বাড়ীর পিছনে পুকুরটার পারে চলে যাই।

একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না। এখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে, কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই। আমার তীর ধনুক আছে অবশ্য, তা

দিয়ে বাঘ মারা যায় না। আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দু-একবার। কিন্তু ঐ কবরখানাটার পাশ দিয়ে যেতে বেশি গা ছমছম করে। বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ বলেছিল, ঐ কবরখানায় ভূত আছে। আমি এদিক ওদিক তাকাই, কখনো ভূত দেখতে পাই না। কিন্তু কী রকম যেন একটা বোঁটকা গন্ধ পাই। আর থাকতে ইচ্ছে করে না, এক ছুটে ফিরে আসি। আমার যদি আর একটা বন্ধু থাকতো, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা দুজনে মিলে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখানে এসে এখনো যে আমার কোনো নতুন বন্ধু হয়নি। একা একা ভূত দেখতে যেতে বড্ড খারাপ লাগে।

আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ছোট ছোট ইঁটের টুকরো বা পাথর ছুঁড়ে মারি জলের ধারে।

পুকুরটা বিরাট বড়, আর এখন বর্ষাকাল বলে কানায় কানায় ভরা। দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গভীর মনে হয়। কোথাও কোন লোকজন নেই, আমি শুধু একা। এক এক সময় আমার মনে হয়, আমাকে যেন কেউ দেখছে। যদিও কোথাও আর কেউ নেই, তবু যেন মনে হয়, আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক চেয়ে দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।

এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে, অমনি জলের উপরে গোল গোল ঢেউ ওঠে। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখলাম, পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে। যেন ঠিক ঐখানটায় কোনো বিরাট কিছু প্রাণী দাপাদাপি করছে। এত বড় তো মাছ হতে পারে না। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

তারপর থেকে আমি সব সময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি। কিন্তু আর কিছু দেখা যায় না। আবার পুকুরটা শান্ত আর গম্ভীর!

পুকুরের ঘাটটা অনেক দিনের পুরোনো। পাথর দিয়ে তৈরী, কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা জাগয়াগুলোয় গর্ত হয়ে সেখানে জল জমে থাকে, সেই জলেও ছোট ছোট মাছ দেখা যায়।

আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি। আমার তো বঁড়শী নেই, আর বঁড়শী দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি না। তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি। এক ধরনের মাছ, জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুয়ে

থাকে। ওগুলোর নাম বেলে মাছ। সেই মাছগুলো আমাকে কাছাকাছি দেখেও ভয় পায় না। মাছগুলো অবশ্য দারুণ চালাক। আমি আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করি, ওদের একেবারে গায়ের কাছে হাত দেবার পর সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়। পাথরের তলার মধ্যেও অনেকখানি গর্ত আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়ে।

মাছ ধরার ঝোঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় কে যেন ডাকলো, এই বাবলু!

আমি চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো! তাহলে আমায় কে ডাকলো? স্পষ্ট শুনলাম, অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা। মা তো ঘুমোচ্ছেন, তাহলে কে ডাকলো। খুব কাছ থেকে! মা-ই কি আমাকে ডেকে চট করে কোথাও লুকিয়ে পড়লেন।

জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম। কেউ নেই। কাছেই একটা মস্ত কদম ফুলের গাছ, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাও নেই। অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগলো। কেউ কোথাও নেই, তাহলে আমায় ডাকলো কে? আমি যে স্পষ্ট শুনেছি! দৌড়ে চলে এলাম বাড়ীতে। দোতলায় এসে দেখলাম, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি তবু মাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি কি এই মাত্র পুকুর ঘাটে গিয়েছিলে?

মা তো অবাক। বিছানার উপরে উঠে বসে বললেন, কেন, পুকুরঘাটে যাবো কেন? তুই বুঝি গিয়েছিলি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি সেখানে খেলা করছিলাম, মনে হলো পেছন থেকে কে আমাকে ডাকলো। ঠিক তোমার মতন গলা।

মা বললেন, তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস!

—না, মা! আমি স্পষ্ট শুনলাম।

মা রেগে গিয়ে বললেন, তুই কেন পুকুর ঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা? দুপুরবেলা কেউ একলা যায়?

—কেন, কী হয় তাতে?

—না, কক্ষনো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই! আর কোনদিন যাবি না। তোর পড়াশুনো নেই?

—পড়াশুনো তো হয়ে গেছে।

—তা হলেও যাবি না! খবরদার।

মা আমাকে টেনে নিয়ে তার পাশে শুইয়ে দিলেন। পুকুর ধারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে, মা একথা বিশ্বাসই করলেন না।

বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ীতে আসে কী সব অফিসের কাজ নিয়ে। মুনাব্বর খাঁ খুব দারুণ দারুণ গল্প বলতে পারে। সে-ই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমি মুনাব্বর খাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। এই পুকুরটার মধ্যে কত বড় মাছ আছে বলো তো? তুমি জানো?

মুনাব্বর খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, কেন বলো তো খোকাবাবু আমি বললাম, একদিন দুপুরবেলা আমি দেখেছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জিনিস জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। সেটা যদি মাছ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে।

মুনাব্বর খাঁ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বললো, খোকাবাবু, দুপুরবেলা পুকুরের ধারে কক্ষনো একলা যেও না। যেতে নেই।

—কেন, গেলে কী হয়?

—অনেক রকম বিপদ হয়। তুমি জানো না, এই সব পুরোনো পুকুরে পানিমুড়া থাকে।

—পানিমুড়া কী?

—পানিমুড়া জানো না? পানিমুড়া হচ্ছে জলের ভূত!

—ধ্যাৎ! জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি?

—ওমা, তুমি পানিমুড়ার কথা শোনো নি? এতো সবাই জানে। পানিমুড়া বড়দের কিছু বলে না। কিন্তু ছোটদের তলায় টেনে নিয়ে যায়।

—মুনাব্বর খাঁ, তুমি পানিমুড়া দেখেছ?

—হ্যাঁ, তিনবার দেখেছি। তাদের মাথাটা হয় কুমীরের মতন, আর গা-টা মানুষের মতন। এই সব পুকুর জানো তো, খুব পুরোনো, আগেকার দিনের রাজাদের আমলের। এই সব পুকুরের মাঝখানে গাদ্দি থাকে।

—গাদ্দি কী?

—গাদ্দি মানে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত। যারা পানিতে ডুবে মরে, পানিমুড়া ভূত হয়ে যায়, ঐ সুড়ঙ্গের

মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে ওপরে উঠে আসে। পানিমুড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতদের খুব ঝগড়া। পানিমুড়ারা ওপরে উঠে এলেই কবরখানার ভূতরা তাদের তাড়া করে যায়। আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানিমুড়া আর একটা কবরখানার ভূত খুব ঝটাপটি করে লড়াই করছে!

এই সময় মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গল্প হচ্ছে?

আমি বললাম, মা, তুমি পানিমুড়া ভূত দেখেছো কখনো? মুনাব্বর খাঁ দেখেছে!

মা বললেন, বসে বসে বুঝি ভূতের গল্প হচ্ছে এই সন্ধ্যেবেলা! মুনাব্বর তুমি বাবলুকে বানিয়ে বানিয়ে ওসব গল্প বলো না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? কিচ্ছু নেই! ভূত হচ্ছে মানুষের কল্পনা।

মুনাব্বর বললো, না, মেমসাব! আমি নিজের চক্ষে দেখেছি।

মা হেসে বললেন, ছাই দেখেছো!

আমার মায়ের খুব সাহস। মা একদিন রাত্তিরবেলা একা একা কবরখানায় গিয়েছিলেন ভূত দেখার জন্য। কিচ্ছু দেখতে পাননি। মাকে দেখে ভূতেরা ভয় পেয়েছিল। বাবা বলেছিলেন তোমার হাতে টর্চ ছিল তো, সেই আলো দেখে ভূতেরা পালিয়ে গেছে। তুমি অন্ধকারে একবার গিয়ে দেখো তো!

মা বলেছিলেন, ওখানে অনেক সাপখোপ আছে। অন্ধকারে গেলে যদি সাপে কামড়ায়? আমি ভূতের ভয় পাই না, কিন্তু সাপকে ভয় করি।

দু'তিন দিন আমি আর পুকুর ধারে যাইনি। কিন্তু আমার মন ছটফট করে। দুপুরবেলা কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে কারুর। মা ঘুমিয়ে পড়েন, আমার যে ঘুম আসে না! পড়া গল্পের বইগুলি আরও কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম।

তারপর আবার একদিন, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম আবার। আজ আমার সঙ্গে একটা ছোট লাঠি। যদি ভূত-টুত আসে তাহলে লাঠি দিয়ে মারবো।

পুকুরের কাছে এসে দেখি, ঘাটের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের ডোরাকাটা গেঞ্জি আর মাথায় এমন টাক যে একটাও চুল নেই। লোকটা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে। সারা গা ভেজা। লোকটা এলো কোথা থেকে? আমাদের এই পুকুরে তো বাইরের কোনো লোক স্নান করতে আসে না!

আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখলো। দেখেই যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফ মেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। তারপর ডুবে গেল।

আমিও খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখে ওরকম ভয় পেল কেন? আমার হাতের লাঠিটা দেখে? চোর-টোর নয় তো? যদি চোর হয়, লোকটা তাহলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জঙ্গল দিয়ে পালাবে। আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে, আর উঠছে না। এতক্ষণ কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে! আমি মনে মনে এক দুই তিন করে পাঁচশো পর্যন্ত গুণে ফেললাম, তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না। এই রে, লোকটা মরে গেল না তো? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না।

তা হলে কি এক্ষুনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত? কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? আরও একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তখন আমার মনে হলো, ওটা ভূত নয় তো? ও-ই কি পানিমুড়া? কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে। মুনাব্বর খাঁ যে বলেছিল, পানিমুড়ার মুখটা কুমীরের মতন! এ যে একদম মানুষের মতন। শুধু টাক মাথা। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল তখন দেখেছি, ওর চোখের ওপর ভুরুও নেই। সারা গায়ে কোনো লোমও নেই। মুনাব্বর নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছিল। সে পানিমুড়া কোনদিন দেখেনি।

তক্ষুণি ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেবো ভাবছি, এক সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠলো। শুধু একটা হাত। আমি ভাবলাম, লোকটা এবার উঠে আসবে। তা হলে পানিমুড়া নয়। কোনো চোরই নিশ্চয়ই।

শুধু হাতটাই উঁচু হয়ে রইলো, আর কিছু না। লোকটার মাথাও দেখা গেল না। তারপর মনে হলো, সেই হাতটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতে লম্বা লম্বা আঙুল, তাতে বিচ্ছিরি নোখ। হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগলো। ঠিক যেন আমায় ডাকছে।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

তখন দেখলাম, জলের মধ্যে দুটো চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। চোখ দুটো মাছের মতন, পলক পড়ে না। কিন্তু মাছের নয়, চোখ দুটো সেই লোকটার! একবার ইচ্ছে হলো, পালিয়ে যাই।

আবার ভাবলাম, দেখি না শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমার তো হাতে লাঠি আছে।

এবার সেই হাতটা খুব কাছে চলে এল। মনে হলো যেন আমার পা চেপে ধরবে। এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু! বাবলু!

কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার ওপর। ঠিক লাগলো কিনা বুঝতে পারলাম না, হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

আবার কেউ আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু বাবলু!

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সামনে জলের ওপর সেই হাতটা আবার উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম, অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল, আমি ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম!

জলে পড়েই মনে হলো, আমি আর বাঁচবো না। আমি যে সাঁতার জানি না! পানিমুড়া আমার পা ধরে সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, ওমা—! মা!

জলের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম। দম আটকে আসছে। পানিমুড়া এখনো আমার পা ধরেনি। আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে পাচ্ছে না বোধ হয়।

এরই মধ্যে একবার কোনো রকমে জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম, মাঠ দিয়ে ছুটে আসছে আমার মা। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, মা—কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম। মা পাড় থেকেই এক লাফ দিয়ে জলে পড়লেন।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি আমাদের বাড়ীর বাইরের ঘরে শুয়ে আছি। মা আর আমাদের রাঁধুনি আমার গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। আমি চোখ

মেলতেই মা বললেন, আমি বলেছিলাম না, ওর পেটে বেশি জল ঢোকেনি। এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে!

মা ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কী যে হত, ভাবতেও আমার আজও গা কাঁপে। মা ওখানে গেছেন কি করে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পরে শুনেছি সে কথা। মা ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানের কাছে কে যেন ডাকলো, মা, মা! ঠিক আমার গলা। মা চোখ মেলে দেখলেন, কেউ নেই। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন।

তখন বাইরে থেকে আবার সেই মা মা ডাক শোনা গেল। তারপর পুকুর ঘাট থেকে।

আমি জলে পড়ার সময় মা মা বলে ডেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এত দূর থেকে মায়ের তো সেটা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন।

মা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাবলু, তোকে আমি একা একা পুকুর ঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম, তবু গেলি কেন? কেন জলে নেমেছিলি?

আমি বললাম, মা, আমাকে পানিমুড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মা বললেন, বাজে কথা।

আমি বললাম, না সত্যি!

মা বললেন, মোটেই না! তুই পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলি!

মা কিছুতেই পানিমুড়ার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমাদের রাঁধুনি বললো হ্যাঁ গো দিদি, এসব পুরোনো পুকুরে অনেক ভয়ের জিনিস থাকে।

মা বললেন, সাঁতার না জানলে লোকে জল দেখে ওরকম অনেক ভয়ের জিনিস বানায়। আমি কাল থেকেই বাবলুকে সাঁতার শেখাবো।

এরপর সাতদিনের মধ্যে আমি সাঁতার শিখে গেলাম। পানিমুড়াকে আর কখনো দেখিনি। তবে আমি সাঁতার কাটতে যেতাম নদীতে, ঐ পুকুরে আর নয়।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম অ্যারিজোনার টুসন্ বিমান বন্দরে। যাবো শিকাগো শহরে। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ওদেশে সন্ধ্যে হয় খুব দেরিতে, তখনও আকাশে আলো আছে। আমি লাউঞ্জের বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। প্লেনটা আসতে দেরি করছে, আর সেই জন্য ছটফটানি শুরু হয়েছে আমার মনে। শিকাগো পৌঁছতে খুব বেশি রাত হলেই মুস্কিল। কারণ শিকাগো এয়ারপোর্টে আমার এক বন্ধু গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে, তার গাড়িতে আমি যাবো সীডার র‍্যাপিডস্ নামে একটা ছোট্ট শহরে। সেটা আরো প্রায় দুশো মাইল দূরে। গাড়িতে যেতে ঘণ্টা তিনেক লেগে যাবে।

আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে প্লেনটা দেখা গেল আকাশে একটা গোল চক্কর দিয়ে নামছে। এই প্লেনটা আসছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে, ওখানে বিকেলবেলা খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল খবর পাওয়া গেছে।

প্লেনটাকে দেখেই আমি কাউন্টারের দিকে ছুটলাম। টিকিট 'ওকে' করে নিতে হবে। প্লেন এসে না পৌঁছালে ওরা টিকিটের এই ছাড়পত্র দেয়না।

কাউন্টারে আমার সামনে মাত্র আর একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ আমি দ্বিতীয়। আমার টিকিট 'ওকে' হবেই, কোন চিন্তা নেই।

আমার সামনের লোকটি ছোটোখাটো দৈত্যের মতন। লম্বায় সাড়ে ছ'ফুট তো হবেই, তেমনি চওড়া। গায়ে একটা জারকিন। লোকটি পেছন ফিরে একবার আমার দিকে তাকালো। লোকটি মুলাটো, অর্থাৎ পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গও নয়, কালোও নয়। মাথার চুল কোঁকড়া, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

ওদের নিয়ম অনুযায়ী আমার চোখাচোখি হতেই লোকটি বললো, হাই! আমি বললুম হাই! লোকটি তারপর বললো, গোয়িং টু শিকাগো? আমি বললুম ইয়া!

লোকটির কি গুরু গম্ভীর গলা।

লোকটির কাঁধে ঝোলানো শুধু চামড়ার ব্যাগ। আর কোন মালপত্র নেই। কাউন্টারের লোকটি এসে দাঁড়াতেই আমার সামনের লোকটি ব্যাগ খুলতে গেল। আমিও বোধহয় অতি উৎসাহের চোটে একটু সামনে ঝুঁকেছিলাম, তারপরই একটা কাণ্ড হয়ে গেল!

লোকটির হাত যে অত লম্বা তা আমি বুঝতে পারিনি, ব্যাগ খুলতে গিয়ে লোকটির একটা কনুই পিছিয়ে এসে সোজা ধাক্কা মারলো আমার বাঁ চোখে। আমি বাংলায় 'বাপরে' বলে চিৎকার করে বসে পড়লুম।

তারপর কী হলো আমি চোখে দেখতে পাইনি। আমার চোখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে রক্ত পড়ছে। নানান লোকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, দু-এক মিনিটের মধ্যেই কারা যেন আমায় সাবধানে তুলে শুইয়ে দিল স্ট্রেচারে তারপরই অ্যাম্বুলেন্সের প্যাঁ প্যোঁ শব্দ। আমি অজ্ঞান হইনি, অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও আমার মনে পড়ছে, আমার ঐ প্লেনটা আর ধরা হলো না। শিকাগো এয়ারপোর্টে আমার বন্ধু গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এক ঘন্টার মধ্যে ডাক্তাররা আমার চোখ পরীক্ষা করে ওষুধ লাগিয়ে, মস্ত বড় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, আমি কি এর পর পৌনে দশটার প্লেন ধরতে পারবো?

বড় ডাক্তার জানালেন তাঁর কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে এখানে অন্তত তিনদিন শুয়ে থাকতে হবে। তাঁদের কথা যদি আমি না শুনি তাহলে আমার বাঁ চোখটা চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কী আর করি, আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম! একটা চোখ কে আর নষ্ট করতে চায়। বিদেশ-বিভুঁয়ে একটা হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে থাকতে হলো আমায়। এর আগে দেশে বা বিদেশে কক্ষণো আমি হাসপাতালে থাকিনি।

এই হাসপাতালের প্রত্যেক কেবিনে একটা করে টেলিভিশন সেট। নার্স সেট চালিয়ে দিয়ে গেছে। এক চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বলে অন্য চোখটাও খুলতে কষ্ট হচ্ছে আমার। তাছাড়া এখন টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দেখার মেজাজও নেই। কথা আর গান বাজনাগুলো শুনতে পাচ্ছি। দশটার সময় শুরু হলো খবর। টেলিভিশনে খবর পড়াটা এরা খুব আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রথমে একজন খবর বলে নিউ ইয়র্ক থেকে, তারপর সেই লোকটি হঠাৎ কথা থামিয়ে বলে, হ্যালো জ্যাক, হোয়াট্‌স আপ দেয়ার? অমনি দেখা যায় তিন হাজার মাইল দূরে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসে আছে আর একজন, সে তখন ওদিককার খবর বলে। এমনি ভাবে ওয়াশিংটন ডি সি থেকে আরেকজন। কখনো কখনো জাপান, ভিয়েতনাম, ফ্রান্স বা আফ্রিকা থেকেও ওদের প্রতিনিধিকে সরাসরি খবর বলতে দেখা ও শোনা যায়। এন. বি. সি. নিউজের জ্যাক রবসনের খবর পড়া আমার বেশ ভালো লাগে। সে শুরু করতেই আমি কান খাড়া করলুম। জ্যাক প্রথমেই বললো, আজ সন্ধ্যেবেলা ফ্লাইট নাম্বার পাঁচশো বাহাত্তর হাইজ্যাকড হয়েছে।

উত্তেজনায় সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে বসলুম। অতি কষ্টে ডান চোখটা মেলে তাকালুম টেলিভিশন সেটের দিকে। ফ্লাইট নাম্বার পাঁচশো বাহাত্তর? ঐ প্লেনটাতেই তো আমার যাওয়ার কথা ছিল!

এই প্রথম সেই দৈত্যের মতন চেহারার মুলাটো লোকটির উপর আমার খুব রাগ হলো। ঐ লোকটা তার লম্বা ধেরেঙ্গা হাতের কনুই দিয়ে আমায় খোঁচা মারলো বলেই তো আমি এখন একটা দারুন সুযোগ হারালুম; হাইজ্যাকিং-এর সময় সেই বিমানে থাকার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের! যারা হাইজ্যাকিং করে তারা তো যাত্রীদের মারেনা, সব ব্যাপারটা বেশ দেখা যায়।

জ্যাক রবসন আরও জানালো যে হাইজ্যাকড প্লেনটা প্রথমে যাচ্ছিল কিউবার দিকে, কিন্তু সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কিউবায় সেটা নামেনি, সেটা উড়ে গেছে 'আননোন্ ডেস্টিনেশনের' দিকে। আননোন্ ডেস্টিনেশন, সে যে আরও রোমঞ্চকর ব্যাপার। আমি নিরাশ হয়ে পড়লুম।

বেল বাজিয়ে নার্সকে ডাকলুম একবার।

ছোট্ট খাট্টো চেহারার ফুটফুটে নার্স এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম, সিস্টার, আমাকে এখানে কে ভর্তি করে দিল?

নার্স বললে, তোমাকে তো নিয়ে এসেছে এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি স্টাফ।

যে লোকটা আমায় কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরেছে সে আসে নি?

তোমায় কে ধাক্কা মেরেছে? সে কথা তো কেউ বলে নি!

হ্যাঁ, আমার সামনের লোকটির কনুয়ের ধাক্কাতেই তো...।

—সে কথা তাহলে তুমি পুলিশকে জানাতে পারো। লোকটার নাম জানো তুমি?

—নাম জানিনা! তবে চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে।

—সেই কথাই পুলিশকে জানিয়ো, পুলিশ ঠিক নাম বার করে ফেলবে। তারপর ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারো তার কাছ থেকে।

—আচ্ছা থাক, পরে ভেবে দেখবো। টিভি বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে দিয়ে যাও।

এদেশে সব ব্যাপারেই ক্ষতিপূরণ। সামান্য সামান্য ব্যাপারে মামলা করেই অনেক টাকা পেয়ে যায়। মামলা না করলেও ইনসিওরেন্স কম্পানি দেয়। আমার এক বন্ধু হিচ হাইকিং করার সময় একটা গাড়িতে বিশ পয়সার রাইড নিয়েছিল, সেই গাড়িটা অ্যাকসিডেন্ট করলো ব্লুমিংটন শহরের কাছে, আমার বন্ধুটির একটা পা মুচকে গিয়েছিল শুধু। খুবই সামান্য ব্যাপার, একটু চুন-হলুদ লাগাতেই সেরে যাবার মতন। তাতেই ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছে দু হাজার ডলার।

বিদেশে বেড়াতে এসে ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। পুলিশের সঙ্গে কে নিজেকে জড়াতে চায়। তবু আমি মনে মনে বললুম লোকটা খুব অভদ্র তো! হয়তো সে ইচ্ছে করে আমায় ধাক্কা দেয়নি; তবু আমার কাছে এসে একবার অন্তত দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল তার।

চোখের যন্ত্রণায় ঘুম আসছে না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলুম! কমিক্স-এর গল্পের ছবির মতন যেন দেখতে পেলুম, সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ফ্লাইট নাম্বার পাঁচশো বাহাত্তর; ওর ভেতরে ককপিটের সামনে পাইলটের কপালের কাছে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমান

দস্যু...সবাই ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে করে আছে। হঠাৎ আমার মনে হলো, ঐ দৈত্যের মতন চেহারার লোকটাই বিমানদস্যু নয় তো? ওর চেহারা তো ঠিক ডাকাতেরই মতন! হয়তো ওর আরও সঙ্গী ছিল। বিমানটা ছিনতাই করে বোধহয় চলে যাচ্ছে আফ্রিকার কোনো দেশে...। বেশ একখানা গল্প ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম একসময়ে।

পরদিন সকালেই কাগজে বড় বড় করে খবর বেরুলো, হাইজ্যাক করা বিমানটা আকাশেই ধ্বংস হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে গ্যাল্‌ফ অফ মেক্সিকোতে। ছাপান্ন জন যাত্রীর মধ্যে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায় নি। সবাইকে মৃত বলে ধরে নেওয়া যায় নিশ্চিত ভাবে! দুর্ঘটনা হয় রাত সাড়ে দশটায়, তারপর শেষ রাত পর্যন্ত সার্চ পার্টি সেখানকার সমুদ্র এলাকা খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে উদ্ধার করতে পারেনি। পৃথিবীর সব কাগজেই বেরিয়েছিল এই খবর। খবরটা পড়ে যে আমার কী মনে হলো কী বলব! ঐ শীতের দেশেও সারাগায়ে ঘাম এসে গেল, ঝিম ঝিম করতে লাগলো মাথাটা। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। ঐ প্লেনে আমার থাকার কথা ছিল। চোখে এই ধাক্কাটা না লাগলে, এতক্ষণ আমার দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে গাল্‌ফ অফ্‌ মেক্সিকোতে ভাসছে আর হাঙর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

খবরের কাগজটা তন্নতন্ন করে পড়লুম। প্লেনটা কেন ভেঙে পড়লো তার কারণটা ঠিক জানা যাচ্ছে না। পাইলট প্রথম খবরটা জানাবার পর আর কিছু বলতে পারেনি। খুব সম্ভবতঃ প্লেনের মধ্যে গুলি চলেছে। পুলিশের লোক বলেছে যাত্রীদের মধ্যে একজন নাকি নেভাডার লাস ভেগাস শহরে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তারপর পাওনাদারদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছিল টুসন-এ, সেখান থেকে প্লেন হাইজ্যাক করে অন্যদেশে আশ্রয় নেবার মতলবে ছিল। তারপর কী হয়েছে, কেউ জানে না।

আমার কেন যেন দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল, সেই দৈত্যের মতন মুলাটো লোকটাই এইসব কাণ্ড করেছে। লাইনের একেবারে প্রথমে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এরকম কাণ্ড হবার পরও একটুও অপেক্ষা করেনি। এত ব্যস্ত ছিল প্লেনটা ধরবার জন্য!

দুপুরের দিকে আমার মনে হলো, ঐ লোকটা ইচ্ছে করেই আমায় ধাক্কা দেয়নি তো? লোকটা জানতো, ঐ প্লেনে নানা রকম বিপদ হবে, তাই ও

আমায় বাঁচাতে চেয়েছিল? কিন্তু আমায় ও চেনে না শোনে না। ও আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করবে কেন? এখন যেন স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমি এগিয়ে যাইনি, লোকটা ইচ্ছে করেই কনুইটা পিছিয়ে এনে খুব জোরে মেরেছিল।

লোকটা কি জানতো, ও নিজেও মরে যাবে? সারাদিন ঐ লোকটার কথা ভাবতে লাগলুম। লোকটির মুখ আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেল একেবারে।

তিনদিন পরে ছাড়া পেলুম হাসপাতাল থেকে। চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে আমায় একটা এক চোখ ঢাকা চশমা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার জানালেন যে, আর ভয় নেই, চোখটা বেঁচে যাবে।

আমায় একশো পঁচাত্তর ডলার চার্জ দিতে হলো। হাসপাতালেও এদেশে পয়সা লাগে। হেল্‌থ ইনসিওরেন্স থাকলে অবশ্য বিনা পয়সায় হয়ে যায়। আমার এখনো করা হয়নি। বিদেশী বলে আমায় সস্তা করে দেওয়া হয়েছে অবশ্য, নইলে অনেক বেশি টাকা লাগতো। এই একশো পঁচাত্তর ডলার দিতেই আমার গা কচ্‌কচ্‌ করতে লাগলো। বিদেশে এসে সব সময় হিসেব করে চলতে হয় টাকা পয়সা। আমার কোন দোষ নেই, তবু শুধু শুধু খরচ হয়ে গেল কতগুলো টাকা।

প্লেনের টিকিটটা অবশ্য বাতিল হয়নি। সেই টিকিটেই ফিরে এলুম শিকাগো-তে।

এরপর দেড় মাস কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধব যাদেরই বলেছি যে অভিশপ্ত ফ্লাইট নাম্বার পাঁচশো বাহাত্তর বিমানটায় আমার আসবার কথা ছিল, কেউ বিশ্বাস করে না। একটা লোক আমার চোখে ধাক্কা দিয়েছিল বলে আমি হাসপাতালে ছিলাম শুনেও ওরা হাসে। এমন কি যে বন্ধুটির কথা ছিল শিকাগো এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করার, সেও বললো, "তুই যে ঐ প্লেনে আসবি না, সেই খবরটা আমায় ঠিক সময় জানাসনি তো তাই এসব গল্প বানাচ্ছিস। ওটা মোটেই ফ্লাইট নাম্বার পাঁচশো বাহাত্তর ছিল না।"

তারপর কানাডার তিনশো দু'জন যাত্রীসমেত আর একটা প্লেন হাইজ্যাকড হতেই আগেরটার কথা সবাই ভুলে গেল। এই প্লেনটা নেমেছে সাহারা মরুভূমির কাছে একটা ছোট শহরে, দারুণ রোমহর্ষক ব্যাপার!

আমি থাকি আরওয়া সিটি নামে একটা ছোট শহরে! একটা তিন তলা কাঠের বাড়ীর দোতলায় আমার ফ্ল্যাট। সকাল নটা থেকে একটা পর্যন্ত একজায়গায় কাজে যাই, তারপর সারাদিন আমার ছুটি। আমার ঘরের জানালা দিয়ে একটা নদী দেখা যায়। কদিন ধরে বরফ পড়তে শুরু করেছে। জানালা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি। সেই নদীটার জল আস্তে আস্তে জমে যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নদীর মাঝখানে গিয়ে খেলে। নদীর ধারে সারি সারি উইলো গাছ, সেগুলোর গায়ে ঝুরো ঝুরো বরফ জমে আছে। দূর থেকে মনে হয় থোকা থোকা সাদা ফুল।

একদিন দুপুরে আমার ফ্ল্যাটের দরজায় দুম্ দুম্ করে ঘা পড়লো। কলিং বেল্ আছে, সেটা না টিপে কে এমন ধাক্কা মারছে?

আমি বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলুম, কে?

ভারিক্কি গলায় উত্তর এলো মেইলম্যান।

এ দেশের মেইলম্যানদের চেহারা আর সাজ পোষাক দেখলে মনে হয় মিলিটারি। এরা পায়ে হেঁটে চিঠি বিলি করে না, প্রত্যেকের নিজস্ব গাড়ি আছে। সাধারণত নিচের ডাক বাক্সতেই এরা চিঠি দিয়ে চলে যায়। রেজিষ্ট্রি কিংবা মানি অর্ডার থাকলে ওপরে আসে।

দরজা খুলে মেইলম্যানটিকে দেখে এতই অবাক হয়ে গেলুম যে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে!

লোকটি আমার অবস্থা দেখে হেসে বললেন, হেই ম্যান, হোয়াজ্জা ম্যাটার? হ্যাভ যু সীন আ গোষ্ট্ অর সামথিং?

আমার তখন সত্যিই ভূত দেখার অবস্থা।

ঠিক সেই রকম গলার আওয়াজ, অবিকল সেই চেহারা। সেই সাড়ে ছ'ফুট লম্বা তেমনি চওড়া, কালোও না ফর্সাও নয়, মূলাটো মাথার চুল কোঁকড়া, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

লোকটা একটা ফর্ম আর একটা কলম এগিয়ে দিয়ে আমায় বললেন, সই করো।

কথা তো নয়, যেন হুকুম। যন্ত্রের মতন আমি সই করলুম। তারপর লোকটা আমার হাতে একটা খাম দিল।

তারপর সে চলে যাবার জন্য পেছন ফিরতেই আমি বললুম, পর্ডন মী। আমি কি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

লোকটি আবার ঘুরে তাকিয়ে কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী? আমি বললুম, তোমায় আমি আগে দেখেছি মনে হচ্ছে।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তা দেখে থাকতে পারো, আমি তো এদিকে প্রায়ই আসি।

আমি বললুম তা নয়, তোমাকে আমি দেখেছি একটা বিশেষ জায়গায়...তুমি কখনো টুসন-এ গেছো!

লোকটি কর্কশ গলায় বললে। টুসন? সেটা আবার কোথায়? হোয়ার দা হেল ইজ দ্যাট ড্যাম্‌নড প্লেস?

আমি এবার বানান করে বললুম, টি ই সি এস্ ও এন্। অনেকে বলে টাক্‌সন আসলে ওটা টুসন উচ্চারণ হবে। আরিজোনা স্টেটে।

লোকটি বলল, আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলেই কখনো যায়নি।

আমি দ্রুত চিন্তা করতে লাগলুম। দুজন মানুষের চেহারায় এমন মিল হতে পারে? পাঁচশো বাহাত্তর বিমান দুর্ঘটনায় একজনও বাঁচেনি! এই লোকটাই বা বাঁচবে কি করে? এক যদি যমজ হয়—

আবার জিজ্ঞেস করলুম, তোমার কোন যমজ ভাই আছে?

লোকটা এবার হাসল বেশ জোরে, তারপর বললো, টুইন ব্রাদার? সিয়ামিজ টুইন, হা-হা-হা! তুমি দেখছি খুব মজার লোক! আমি আজ পর্যন্ত কোন যমজ দেখিনি! আমার এমনি এক ভাই ছিল বটে, নিউইয়র্কের হার্লেমে এক দাঙ্গায় সে মারা গেছে পাঁচ বছর আগে, কেন, তোমার এত কৌতূহল কেন?

এবার আমি লজ্জিতভাবে বললুম, না, না, কিছু না এমনিই। কিছু মনে করো না, ক্ষমা চাইছি, যদি তোমায় বিরক্ত করে থাকি—

লোকটি আমার কাঁধ চাপড়ে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইউ আর ওয়েলকাম! দিস ইজ আ ফ্রি কানন্ট্রি।

কাঠের সিঁড়ি দুপ দুপিয়ে লোকটি নেমে চলে গেল। এবার আমি হাতের খামটা ছিঁড়লাম। তাকে একটা চেক। আবার আমি অবাক। আমায় কে টাকা পাঠাবে?

চিঠিটা পড়ে দেখলুম, কোন একটা ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতায় আমি একটা পুরস্কার পেয়েছি। আমার তখন রীতিমতন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতন অবস্থা। সময় কাটাবার জন্য আমি মাঝে মাঝে খবরের কাগজের ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল সমাধান করার চেষ্টা করি বটে। কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত সবগুলি পারি না। কোনদিন তো আমি প্রতিযোগিতার ফর্ম ফিলাপ করে পাঠাইনি। তা হলে পুরস্কার পাবো কি করে? নাকি কোন এক সময় একটা পাঠিয়েছিলুম। এখন ভুলে গেছি।

আরও চমক লাগলো, যখন দেখলুম, চেকটা একশো পঁচাত্তর ডলারের।

সেই মেইলম্যানকে আমাদের রাস্তায় আর কোনো দিন দেখিনি আমি। এ নিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাও যায় না। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অলৌকিক কিছু! আজও সব জিনিসটা আমার কাছে একটা ধাঁধার মতন মনে হয়।

আমি সত্যানুসন্ধিৎসু, সত্য কখনও মিথ্যার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে না। এমন কি সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও অবশেষে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সেই অদ্ভুত লোকটা

এক একটা মানুষের কিছুতেই বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। চল্লিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে। ঠিক এই রকমই একটা লোক বসে থাকে পার্ক সার্কাস ময়দানে। প্রত্যেক শনিবার। লোকটি পরে থাকে একটা সরু পাজামা আর একটা রঙ-চঙে জোব্বা। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখে চশমা, মাথায় একটা চ্যাপ্টা টুপি।

গনগনে রোদের মধ্যেও লোকটি পার্কের বেঞ্চে দুপুরবেলা বসে থাকে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ঘাসের দিকে।

স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার সময় দীপু মাঝে মাঝে পার্ক-সার্কাস ময়দানের ভেতর দিয়ে শর্টকার্ট করে। লোকটিকে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। একই রকম পোশাক, প্রত্যেক শনিবার ঠিক একই জায়গায় বসে কেন এই মানুষটা? সব সময় ও একলা থাকে, কেউ ওর পাশে বসে না।

একদিন ছুটির পর বৃষ্টির মধ্যে স্কুল থেকে বেরিয়েছে দীপু। পার্কের রেলিং টপকে দৌড় লাগাতে গিয়েই আছাড় খেয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি উঠে ছড়িয়ে

পড়া বইপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় দেখল, একটু দূরের বেঞ্চে সেই দাড়িওয়ালা, কালো চশমা পরা লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

দীপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলো।

দীপুর এখন মোটেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে লোকটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই লোকটাই বা শুধু এখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে কেন?

দীপুর কৌতূহল হল। সে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে।

লোকটি বলল, ইস্টুম, কিস্টুম, দ্রুখ্ দ্রুখ্?

এ আবার কী রকম ভাষা? এই লোকটা কি কাবুলিওয়ালা নাকি? চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। লোকটির রোগা-পাতলা চেহারা দীপু কখনো রোগা কাবুলিওয়ালা দেখে নি।

দীপু বললো, কেয়া? হাম নেই জানতা!

লোকটা এবারে দুটো আঙ্গুল তুলে জিজ্ঞেস করলে, হিন্দী? বাংলা?

দীপু বললো, বাংলা।

এবারে লোকটা ভাঙাভাঙা উচ্চারণে বললো, বেশ কথা! হামি বাংলা জানে। এই লিজিয়ে খোঁকাবাবু, চকলেট খাও!

লোকটা তার জোব্বার পকেট থেকে একটা আধভাঙা চকলেটের টুকরো বার করে দীপুর দিকে এগিয়ে দিল।

দীপুর হাসি পেল। লোকটা কি তাকে ক্লাস সিক্স-সেভেনের ছেলেদের মতন বাচ্চা ছেলে পেয়েছে? ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুমের ওষুধ মেশানো চকলেট খাইয়ে তারপর চুরি করে নিয়ে যাবে? দীপু এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। সে ইচ্ছে করলে এই রোগা লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে।

দীপু বললো, আমি চকলেট খাবো না। আপনি আমায় ডাকলেন কেন?

লোকটি চকলেটটা নিজের মুখে ভরে দিয়ে বললো, তুম্হার নাম তো দীপক মিত্রা আছে, তাই না?

দীপু একটু অবাক হলো। লোকটা তার নাম জানল কী করে? লোকটা তার সঙ্গে ভাব জমাতেই বা চাইছে কেন?

তবু সে বললো, মিত্রা নয়, মিত্র। আমি আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারছি না। কী বলতে চান চটপট বলুন!

লোকটা হঠাৎ সারা মুখ হাসি ছড়িয়ে ফেললো। তারপর বললো, তুমাকে আমার খুব ভালো লাগলো। তুমি হামার বাড়ীতে যাবে? বেশি দেরি হবে না। স্রেফ আধা ঘন্টা থাকবে?

দীপুর মনে হলো, এ লোকটা তো তাহলে সত্যিই ছেলেধরা। স্কুলের কাছে বসে থাকে, ভুলিয়ে ছেলেদের নিয়ে যেতে চায়।

দীপুদের স্কুলের ক্লাস এইটের ছেলে অর্ণব সরকার গত মাসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তাকেও কি এই লোকটা ধরে নিয়ে গেছে নাকি?

দীপুর কিন্তু একটুও ভয় হলো না। সে বললো, আমাকে আপনার বাড়ী নিয়ে যাবেন? কেন? আমি মাছ খাই না, শুধু মাংস খাই। আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ একসঙ্গে মেখে খাই। দুধ আর কোকো মিশিয়ে খাই। এসব খাওয়াতে পারবেন?

লোকটা হা হা করে হেসে উঠে বললো, বেশ তো, আমি তুমাকে মুরগ-মুশল্লাম খাওয়াবো। ঠাণ্ডা লস্যি খাওয়াবো। যদি তুমি একঠো কাম করতে পারো!

ধ্যাৎ! বলে দীপু আবার চলতে শুরু করলো। লোকটা তখনও হাসতে লাগলো জোরে জোরে।

দীপু আর পেছন ফিরে তাকালো না।

একটুখানি যেতে না যেতেই কোথা থেকে একটা মস্তবড় কুকুর তেড়ে এলো দীপুর দিকে। গলায় বেল্ট বাঁধা একটা এ্যালসেসিয়ান। কারুর বাড়ির পোষা কুকুর, হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে।

দীপু এমনিতে কুকুর দেখে ভয় পায় না। কিন্তু এই কুকুরটা তেড়ে আসছে তার দিকেই। পার্কে আর কোনো লোকজন নেই। কুকুরের সঙ্গে ছুটেও পারা যায় না। দীপু তাড়াতাড়ি আর একটা বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালো।

কুকুরটাও সেখানে এসে যেই দীপুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি একটা লাল রঙের ফাঁস এসে পড়লো কুকুরটার গলায়।

দীপু দেখলো সেই কালো চশমা পরা লোকটাই দড়ি ছুঁড়ে কুকুরটাকে বেঁধে ফেলেছে। তারপর কুকুরটাকে টানতে টানতে নিজের কাছে নিয়ে লোকটা তার গলা থেকে ফাঁস খুলে দিল, তারপর কুকুরটার মাথায় একটা চাপড় মেরে বললো, যা, ভাগ্!

অতবড় কুকুরটা এখন দারুণ ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

লোকটা আবার দীপুর দিকে হাতছানি দিয়ে বলো, ইধারে এসো, দীপকবাবু!

দীপু বললো, থ্যাঙ্ক ইউ! আমার বাড়ী ফেরার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ভয় নেই, দীপকবাবু! এক মিনিট ঠারে! একটা কথা বলি। তোমাকে একঠো চীজ দিতে চাই। বহুৎ দামি চীজ।

দামি চীজ, মানে দামি জিনিস? সেটা আমাকে দেবেন কেন?

দেবো, তুমাকে আমার পছন্দ হয়েছে সেই জন্য। তার বদলে তুমাকেও একটা কাজ করতে হোবে। যাবে, আমার বাড়ীতে?

না স্কুল থেকে ঠিক সময়ে বাড়ী না ফিরলে আমার মা চিন্তা করবেন। তাছাড়া আমি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। সামনেই আমার পরীক্ষা—।

ঠিক আছে, বৃষ্টি হামি থামিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো—এক, দো, তিন—।

হাতের সেই লাল রঙের দড়িটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোকটা পাঁচ পর্যন্ত গুণে বললো, এই দেখো, বৃষ্টিকে বেঁধে ফেলেছি হামি, এবারে রোদ উঠবে।

বৃষ্টি সত্যিই থেমে গেল। যদিও আগে থেকেই একটু কমে আসছিল!

দীপু হেসে বললো, আপনি বুঝি কুকুরের মতন বৃষ্টির গলাতেও দড়ি বাঁধতে পারেন? হে-হে-হে! আপনি আপনিই বৃষ্টি কমে গেছে!

লোকটি বললো, তুমাকে আমি আর একটা চীজ দেখাচ্ছি! তুমি এই দড়িটাতে হাত দাও!

দীপু সাবধান হয়ে গিয়ে বললো; না, আমি দড়িতে হাত দেবো না!

ঠিক আছে ঐ গাছটায় হাত দাও!

কেন? তাকে কী হবে।

দিয়ে দেখো না।

লোকটা তার হাতের দড়িটা দিয়ে গাছটার গায়ে একবার মারলো। তারপর দীপু সেই গাছটার গায়ে হাত ছোঁয়াতেই দারুণ চমকে উঠলো। দীপুর সারা শরীরটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠেছে! ঠিক কারেন্ট লাগলে যেমন হয়।

গাছের গায়ে তো কখনো কারেন্ট থাকতে পারে না! এই লোকটা তাহলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে দীপুকে!

ঠিক দীপুর মনের কথাটা বুঝতে পেরেই লোকটা বললো, এ সব ম্যাজিক নেহি, ম্যাজিক নেহি? আসল জিনিস আছে। আর একটা দেখবে? ঐ দেখো, আশমান দিয়ে একঠো এরোপ্লেন যাচ্ছে। যাচ্ছো তো?

দীপু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, প্রায় তাদের মাথার ওপর দিয়েই একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে।

সেই লোকটা লাল দড়িটা ছুঁড়ে দিল শূন্যের দিকে, তারপর বললো, যাঃ!

প্লেনটা অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবারে গা ছমছম করে উঠলো দীপুর। এ কার পাল্লায় পড়লো সে! এই সময় পার্কটা এত ফাঁকাই বা কেন? লোকটা যদি দীপুকেও ঐ দড়িতে বেঁধে ফেলে?

দীপু শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী হলো প্লেনটার? ধ্বংস হয়ে গেল? না, না, ধ্বংস হবে কেন? তা হলে তো ভিতরের আদমিগুলোও মরে যাবে। আমি তো কোনো মানুষ মারি না। আমি শুধু তোমার আঁখ থেকে মুছে দিলাম এরোপ্লেনটাকে। শোনো দীপকবাবু, আমি তুমাকে যে চীজ দেবো বলেছিলাম, তা কোনো আসান চীজ নয়। তুমাকে দেবো আসলি চীজ, তা হলো জ্ঞান। তুমি আমার কাছ থেকে এই জ্ঞান যদি নাও, তবে তুমি অন্ধকারেও দেখতে পাবে, আগুন লাগলে হাত পুড়বে না, তিনদিন কিছু না খেলেও ভুখা লাগবে না, আরও অনেক কিছু পারবে।

ঠিক আছে শিখিয়ে দিন!

আভি তো হবে না। দু'এক ঘন্টা টাইম লেগে যাবে। তার আগে যে তুমাকে একঠো কাম করতে হবে।

কী কাজ বলুন?

তুমি আমাকে একটা দাওয়াই খাওয়াবে।

দাওয়াই, মানে ওষুধ?

হাঁ, হাঁ। আমার বাড়ীতে সেই ওষুধ আছে। খুব দামি হেকিমি ওষুধ। পাঁচ ফোঁটা তাজা রক্ত মিশিয়ে সেই ওষুধ তৈয়ার করতে হয়। চৌদ্দ-পনের বছরের বুকের রক্ত। তুমি সেইটুকু রক্ত আমাকে দেবে?

রক্ত?

হাঁ, মাত্র পাঁচ ফোঁটা! আসলে হয়েছে কি জানো, আমি তো শুধু রোদ্দুর খাই! রোদ্দুর না থাকলেই আমি দুব্‌লা হয়ে যাই। তখন ঐ দাওয়াই খেতে হয়।

আপনি রোদ্দুর খান?

হাঁ, দীপকবাবু! আমি কিছু খাবার খাই না। রোদ্দুর খেলেই আমার শরীর খুব তাজা থাকে! মুস্কিল হয় এই বর্ষাকালে। এক একদিন রোদ্দুরই থাকে না, শুধু মেঘ! শুধু বৃষ্টি! তখন আমি দুব্‌লা হয়ে যাই।

আপনি তো ইচ্ছে করলেই বৃষ্টি থামিয়ে দিতে পারেন। বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়ে রোদ খাবেন!

আরে বাপ রে বাপ! সে কি কখনো হয়! বর্ষাকালে যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তবে কত ক্ষতি হবে! চাষ-বাস হবে না। ধান-গম হবে না। কত লোক না খেয়ে মরবে। আমার একেলার সুখের জন্য কি আমি বৃষ্টি বন্ধ করতে পারি? তুমি আমায় একটু দাওয়াই খাইয়ে দাও! স্রেফ পাঁচ ফোঁটা রক্ত!

দীপু খানিকক্ষণ হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, এখন আপনার বাড়ী যাবো, অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমার মা খুব চিন্তা করবেন! আমি কাল যদি আপনার বাড়ী যাই? কাল মাকে বলে আসবো যে, একটু দেরী হবে।

কাল? ঠিক আসবে?

হাঁ, আসবো! আপনি ভাববেন না যে, আমি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দিতে ভয় পাই! আমি আজকে এখন বাড়ী যাবো।

তা হলে এসো কালকে!

দীপু বারবার পেছনে তাকাতে তাকাতে চলে গেল পার্কটা পেরিয়ে। লোকটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি নেমে গেল আবার।

দীপু অবশ্য এই ঘটনাটা বাড়ীতে কারুকে বললো না। কিন্তু লোকটা তাকে দারুণ ম্যাজিক শিখিয়ে দেবে ভেবে সে খুব উত্তেজিত হয়ে রইলো। পাঁচ ফোঁটা রক্ত তো অতি সামান্য ব্যাপার।

সেদিন বিকেল থেকে সারা রাত বৃষ্টি হলো। পরের দিনও সেই রকম বৃষ্টি। সেদিন রবিবার, দীপুর ইস্কুল বন্ধ। তবু বিকেলের দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে

দেখা করার নাম করে সে চলে এলো সেই পার্কে। সেই লোকটা নেই। এত বৃষ্টির মধ্যে কেউই পার্কে আসে নি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এলো দীপু।

এরপর পর পর কয়েকদিন চললো খুব বৃষ্টি। আকাশে রোদই ওঠে না। দীপুর খালি মনে হয়, সেই লোকটা কিছু না খেয়ে আছে। আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওষুধ খাবে কী করে। অন্য কোনো ছেলে কি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দেবে?

বৃষ্টির জন্য ইস্কুল বন্ধ রইলো দু-দিন। তার পরের শনিবার দীপু ছুটির পরেই দৌড়ে এলো পার্কে। লোকটা আজও বসে নেই তার সেই নিজের জায়গাটায়। কিন্তু সেই বেঞ্চটার ওপরে একটা লাল রঙের দড়ি পড়ে আছে।

এটা কি সেই ম্যাজিকের দড়ি? লোকটা দীপুর জন্যই রেখে গেছে? কিন্তু দীপু সেই দড়িটা ছুঁয়ে কিছুই বুঝতে পারল না। লোকটা তো তাকে তার সেই জ্ঞান কিংবা ম্যাজিক শিখিয়ে যায় নি!

লোকটিকে আর কোনোদিন দেখতে পায় নি দীপু।

জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজ সেইরূপ লোকদেরই প্রয়োজন যাহাদের জীবন প্রেমদীপ্ত, যাহারা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

হলদিয়াতে বিমানের দাদা চাকরি করে। আমি আর বিমান কয়েক দিনের জন্য এসেছি এখানে বেড়াতে। হলদিয়া জায়গাটা বেশ সুন্দর। নতুন বন্দর, নতুন শহর গড়ে উঠেছে। চারদিকে সবই নতুন নতুন বাড়ি আর অনেক ফাঁকা জায়গা। শহরটার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে হলদি নদী।

সকালবেলা নদীর ধারে জেলেরা মাছ বিক্রী করতে আসে। আমরা সেই মাছ কিনতে গিয়েছিলুম। ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বাঁধা। নৌকো দেখেই আমাদের মনে হলো, একটা নৌকো ভাড়া করে নদীতে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়। একজন মাঝিকে জিজ্ঞেস করতেই সে রাজি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা দিলে সে যতক্ষণ ইচ্ছে আমাদের ঘুরিয়ে আনবে।

আমি আর বিমান দু'জনেই সাঁতার জানি, সুতরাং আমাদের জলের ভয় নেই। বিমান তো সুইমিং কমপিটিশনে অনেকবার প্রাইজ পেয়েছে।

আমি আগেই শুনেছিলাম যে হলদিয়ার কাছে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম আগুনমারির চর। আগে সেই চরটা মাঝে মাঝে ডুবে যেত আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠতো। এখন আর ডোবে না। এখন সেখানে গাছপালা জন্মে গেছে। কোনো মানুষজন অবশ্য সেখানে এখন থাকে না।

নৌকো দেখেই আমার ঐ দ্বীপটার কথা মনে এসেছিল। নতুন দ্বীপ মানেই তো নতুন দেশ। ওখানে থেকে ঘুরে এলেই একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন বাদে, যখন ঐ দ্বীপেও অনেক ঘর-বাড়ী হয়ে যাবে, কলকারখানা বসবে, তখন আমরা বলবো, জানো, যখন আমরা আগুনমারিতে গিয়েছিলুম, তখন এসব কিছু ছিল না, শুধু গাছপালা আর...

গাছপালা ছাড়া আর কী আছে সেই দ্বীপে? বুড়ো মাঝি ভয় পাচ্ছে কেন?

নৌকোয় চড়বার সময় মাঝিদের কক্ষনো চটাতে নেই। সেইজন্য আমি অনুনয় করে বললুম, ও বুড়ো কর্তা, বলো না সেখানে কী আছে? কেন আমাদের যেতে বারণ করছো?

বুড়ো মাঝি বললো, কিছু নেই তো বলছি গো বাবু। শুধু কয়েকটা গাছ আর বালি, আর ঐ শামুক ঝিনুক ভাঙা।

বিমান বললো, তাহলে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইছো না কেন? সেখানে কি ভয়ের কিছু আছে?

বুড়ো মাঝি বললো, আকাশে মেঘ দেখো না বাবু। এখন আর অতদূরে যাওয়া ঠিক নয়। এই কিনারায় কিনারায় থাকা ভালো!

বিমান বললো, তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছো? সামান্য মেঘ, এতে কখনো ঝড় ওঠে? তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাওনা তাই বলো।

আমি বুড়ো মাঝির নাতিকে জিজ্ঞেস করলুম, সুলেমান, তুমি গেছো সেই দ্বীপে? সেখানে ভয়ের কিছু আছে?

সুলেমান তার দাদুর দিকে তাকালো একবার। তারপর বললো, কিছু নাইকো। অন্য কিছু দেখাও যায় না। তবে সেখানে গেলে যেন একটা কেমন কেমন করে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

এ তো আরও অদ্ভুত কথা, একটা দ্বীপে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়! আমি আর বিমান দু'জনেই হেসে উঠলুম। তা হলে তো যেতেই হবে সেখানে।

বুড়ো মাঝিকে বললুম, তুমি যদি না নিয়ে যেতে চাও তো আমাদের ফিরত নিয়ে চলো। আমরা অন্য নৌকো ভাড়া করবো।

বুড়ো মাঝি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, সে টাকা ফেরত দেওয়া পাপ। তবে চলেন নিয়ে যাই। পরে যেন আমাকে দোষ দেবেন না। ওরে সুলেমান, ভালো করে টান।

আকাশে মেঘ আছে বটে কিন্তু জমাট কালো নয়। সেই মেঘের ছায়া পড়েছে জলে। রোদ নেই, বেশ ছায়া-ছায়া ছিল। নদীতে বড় বড় ঢেউ। এখানে নদী প্রায় সমুদ্রের মতন। এপার ওপার দেখাই যায় না। পাশ দিয়ে জাহাজ কিংবা স্টিমার গেলে আমাদের নৌকোটা দুলে দুলে উঠছে।

খানিকক্ষণ পরে বুড়ো মাঝি ডানদিকে হাত তুলে বললো, ঐ যে দ্যাখেন, আগুনমারির চড়া। দেখলেন তো?

আমি আর বিমান দু'জনেই ঘাড় ফেরালুম। মনে হলো নদীর বুকেই যেন কয়েকটা গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি দেখা যাচ্ছে না।

বুড়ো মাঝি বললে, দেখা হলো তো? এবারে নৌকো ঘোরাই?

আমি আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠলুম, সে কি, আমরা কাছে যাবো না!

—কাছে গিয়ে আর কী করবেন? আর তো দেখার কিছু নাই!

বিমান এবারে বেশ রেগে গিয়ে বললো, তোমার মতলব কি বলো তো, বুড়ো কর্তা? ঐ দ্বীপে কি তোমার কোনো জিনিসপত্তর আছে? ওখানে আমাদের যেতে দিতে চাও না কেন?

কেন দেখা দিল না

আমার বন্ধু শঙ্করকে গুয়াহাটি যেতে হয়েছিল অফিসের কাজে। আমিও তখন যাচ্ছিলাম দিল্লী হয়ে রাজস্থান। দু'জনে সম্পূর্ণ দু'দিকে যাব। দমদম এয়ারপোর্টে বসে গল্প করলাম খানিকক্ষণ। আমার প্লেন সাড়ে পাঁচটায় আর শঙ্করের প্লেন ছাড়বে সাড়ে ছ'টায়।

শঙ্কর বলল, তুই রাজস্থানে ঘুরবি। শুনে আমার খুব লোভ হচ্ছে। অফিসের কাজ না থাকলে আমি তোর সঙ্গে চলে যেতাম।

আমি বললাম আমারও তো ওদিককার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। না হলে দিল্লীর বদলে ঘুরে আসতাম গুয়াহাটি।

প্লেনে ওঠার জন্য আমার আগে ডাক পড়ল।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, তুই কবে ফিরবি, সুনীল?

আমি বললাম, কুড়ি তারিখ শনিবার সকালে।

শঙ্কর বলল, আমি ফিরে আসব তার অনেক আগেই। তা হলে ওই কুড়ি তারিখ ফিরেই তুই আমার বাড়ীতে চলে আসিস। তোর বেড়াবার গল্প শুনব। আর রাত্তিরে আমরা খাব একসঙ্গে।

আমি চলে গেলাম প্লেনের দিকে। তারপর দিল্লী ছুঁয়ে রাজস্থানে ঘোরাঘুরি করলাম বেশ কয়েকদিন। ইচ্ছে মতন এক এক জায়গায় থেকেছি। কোথায় কোন হোটেলে উঠছি, তা আমার বাড়ীর কেউ জানত না, জানবার দরকারও বোধ করেনি।

ফিরে এলাম ঠিক কুড়ি তারিখেই। আরও কয়েকদিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আজকাল তো ট্রেনের টিকিট যে কোনও সময় চাইলেই পাওয়া যায় না!

বাড়ী ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, দোতলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছোট ভাই। আমাকে দেখে তার মুখখানা যেন ছাই রঙের হয়ে গেল।

সে বলল, দাদা, তুই খবরটা শুনেছিস? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর?

তুই শঙ্করদার খবর এখনও জানিস না?

শঙ্করের খবর? কী হয়েছে শঙ্করের?

আমার ছোটভাই চুপ করে গেল। আমি দৌড়ে ওপরে উঠে এসে তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কী হয়েছে? কিছু বলছিস না কেন?

শঙ্করদা মারা গেছে!

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আমার জ্ঞান চলে গিয়েছিল। মাথায় কিছু ঢুকল না।

তারপর আমি চিৎকার করে বললাম, মিথ্যে কথা। হতেই পারে না!

এই তো সেদিন দেখা হল শঙ্করের সঙ্গে। আমি বিদায় নেওয়ার সময় সে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, কুড়ি তারিখে দেখা হবে। আমার চেয়েও শঙ্করের স্বাস্থ্য অনেক ভাল। সুন্দর চেহারা। সে কী করে হঠাৎ মরে যাবে?

কিন্তু এক-একটা ঘটনা থাকে, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালেও মিথ্যে হয়ে যায় না। এই সব খবর নিয়ে কেউ মিথ্যে ঠাট্টাও করে না।

শঙ্কর সত্যিই নেই। গুয়াহাটিতে গিয়ে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। কোনও চিকিৎসার আগেই তার শেষ নিশ্বাস পড়ে।

অন্য বন্ধু-বান্ধবরা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। খবর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় একদিন পরে, কারণ টেলিফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছিল না। প্লেনে ফিরিয়ে আনার অনেক ঝামেলা। শঙ্করের মামা গুয়াহাটি চলে গিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমি সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগল। শঙ্কর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে আর কোনও দিন দেখা হবে না? আজ কুড়ি তারিখ, শনিবার, আজ সে আমাকে নেমন্তন্ন করে রেখেছিল, তার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করার কথা। আজ আমি শঙ্করের মায়ের সামনে দাঁড়াব কী করে?

শঙ্করের মৃত্যুর পরেও তার চিঠি আসতে লাগল। ও খুব চিঠি লিখতে ভালবাসত। পোস্টকার্ডে ছোট ছোট চিঠি লিখত অনেককে। সেই সব চিঠি এসে পৌঁছতে লাগল অনেক পড়ে। সেই সব চিঠি দেখলেই বুকটা ধক করে ওঠে।

এয়ারপোর্টে শেষ দেখা। শঙ্করের সেই চেহারা এখনও আমার ভাসে, তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই।

তারপর কেটে গেল তিন মাস। শঙ্করের বাড়ীর বৈঠকখানায় আমাদের বন্ধুদের একটা আড্ডা ছিল, এখন আর সেখানে কেউ যায়ই না। তবু প্রায়ই শঙ্করের কথা মনে পড়ে।

আমি আবার একটা নেমন্তন্ন পেলাম মানসের জঙ্গল ঘুরে দেখার। জঙ্গল আমার খুব প্রিয়। ডাক পেলেই ছুটে যাই। আর মানস ফরেস্ট তো অতি বিখ্যাত। থাকার ব্যবস্থা জঙ্গলের মধ্যেই, ডাকবাংলোতে।

তিন দিন ধরে সেই জঙ্গলে প্রচুর ঘোরাঘুরি করার পর একজন অসমিয়া বন্ধু আমাকে তার জিপ গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গেল গুয়াহাটির সার্কিট হাউসে। সেখানে আমার নামে একটা ঘর বুক করা আছে।

কী একটা কারণে যেন অসমের সব সরকারি অফিসে স্ট্রাইক চলছে, তাই সার্কিট হাউসে খাবার পাওয়া যাবে না। অসমিয়া বন্ধুটি বাইরে থেকে একগাদা খাবার কিনে নিয়ে এল আমার জন্য।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর সে বিদায় নিল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সারাদিন জিপ গাড়িতে চেপে ঘুরেছি বলে ধুলোয় গা একেবারে চিটচিটে হয়ে গেছে। তাই আমি স্নান সেরে নিলাম। তারপর খেতে বসলাম।

আজ আর ডাকলে বেয়ারাদেরও পাওয়া যাবে না। প্লেট, চামচ কিংবা এক গ্লাস জলও কেউ দেবে না। সবাই ছুটি নিয়েছে। সার্কিট হাউসের আর কোনও ঘরে কোনও লোক নেই। সার্কিট হাউসটা একেবারে নিস্তব্ধ।

আমি একা থাকতে ভালবাসি। হাতে একটা বই খুলে নিয়ে একা একা খাওয়াটাও পছন্দ করি। যত ইচ্ছে সময় লাগুগ, কেউ মাথা ঘামাবে না।

একখানা লুচিতে আলুর দম ভরে সবে মাত্র মুখে দিয়েছি, জানলার কাছে কিসের যেন একটা শব্দ হল। মুখ তুলতেই মনে হল, কে যেন জানলার পাশ দিয়ে চট করে সরে গেল।

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

কেউ কোনও উত্তর দিল না। যতদূর জানি, আজ সার্কিট হাউসে কোনও লোক নেই। তা হলে কে দাঁড়িয়ে ছিল? কেউ থাকলেও লুকিয়ে পড়বে কেন? চোরটোর নাকি?

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই। তা হলে আমারই ভুল হয়েছে। জানলার পরদাটা উড়ছে, সেই জন্যই ভুল হতে পারে।

ফিরে এসে বইটা তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করতেই আবার ঠকাস করে জানলার একটা পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। এবার যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম জানলার পাশ দিয়ে সরে গেল একটা মুখ।

আবার ধমকের সুরে চেঁচিয়ে বললাম, কে? কে ওখানে?

কোনও উত্তর নেই। চোখে এত ভুল দেখছি।

উঠে গিয়ে আবার দরজা খুলে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। অন্য সব দরজায় তালা লাগানো, মাঝখানে লম্বা বারান্দা, চোর যদি হয় সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শব্দ করবে কেন? কেউ কি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে!

এই লুকোচুরি কথাটা মনে আসতেই মনে পড়ল শঙ্করের কথা।

শঙ্কর এই গুয়াহাটিতে এসেই মারা গেছে। শঙ্করের বড়মামা ছাড়া আর আমাদের চেনাশোনা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। মামা-ভাগ্নেতে মিলে কোনও ষড়যন্ত্র করেনি তো? কোনও কারণে শঙ্কর গুয়াহাটিতে লুকিয়ে থেকে নিজের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিয়েছে?

কিন্তু শঙ্করের ছোট ভাই আর বোনকে আমি কী দারুণ কাঁদতে দেখেছি। শঙ্করের মা শোকে-দুঃখে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে কি কেউ ছেলের নামে এমন মিথ্যে বলতে পারে? শঙ্করের বড়মামাও খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ, তিনি এ-ধরনের নির্মম রসিকতা করতেই পারেন না।

নাঃ, শঙ্কর বেঁচে থাকতে পারে না।

আবার খাওয়া শুরু করলাম। এবার ঘরের মধ্যে একটা দমকা হাওয়া ঢুকে এল, ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা জঙ্গলের ছবি, আর একদিকের দেওয়ালে একটা জঙ্গলের ছবি, আর একদিকের দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

আমি ক্যালেণ্ডারটা তুলবার জন্য উঠতে গিয়েও ভাবলাম, থাক, খাওয়ার পর তুললেই হবে।

তখনই মনে পড়ল, আজকের দিনটাও শনিবার, আর এ মাসের কুড়ি তারিখ। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, শঙ্কর, শঙ্কর, তুই কি লুকিয়ে আছিস? আমার সামনে চলে আয়। আমাকে সব কথা বল।

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তিন মাস আগেকার এক কুড়ি তারিখ, শনিবারে শঙ্করের সঙ্গে আমার খাওয়া-দাওয়া করার কথা ছিল, আজও সেইরকম একটা দিন। শঙ্কর নেই। আজ কি আমি একা একা খেতে পারি?

খাবার সরিয়ে রেখে আমি বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে নিলাম। শঙ্করের জন্য বুকটা হু হু করে উঠল।

বাথরুমের জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যায় অন্ধকার একেবারে ঘুটঘুট করছে। পাশেই বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী। জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু নদীটা দেখা যাচ্ছে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, ঝড়ের মতন হাওয়ায় জানলার পরদা উথালপাথাল করছে। এ ঘরের সব দরজা-জানালায় বড় বড় ভারী পরদা। এমন পরদা, যার আড়ালে কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

একেবারে ফাঁকা সার্কিট হাউস, চোর-ডাকাত ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। আমার কাছে টাকা-পয়সা প্রায় কিছুই নেই, কিন্তু চোর-ডাকাতরা তা জানবে কী করে?

আমি সব ক'টা পরদা সরিয়ে সরিয়ে দেখলাম। দরজায় লাগালাম খিল আর ছিটকিনি। কাচের জানলাগুলোতে শক্ত গ্রিল লাগানো আছে, কেউ ঢুকতে পারবে না।

বইটা পড়ার চেষ্টা করতেই ঝড়ের হাওয়ায় একটা জানলার পরদা খুব উড়তে লাগল। কাচের পাল্লা তো বন্ধ করেছিলাম, খুলে গেল কী করে?

উঠে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। ছিটকিনিটা একটু আলগা মতন, হাওয়ার ধাক্কায় নিজে নিজেই খুলে গেছে। হাওয়া আসছে দারুণ জোরে। অন্য একটা জানলার পরদা সরিয়ে দেখলাম, তার দুটো পাল্লাই খোলা, এটা বোধ হয় বন্ধই করিনি!

এই প্রথম আমি ভয় পেলাম। একই দিকে দুটো জানলা। দুটোই নদীর দিকে। কিন্তু একটা জানলার পরদা দমকা হাওয়ায় উড়ছিল, আর অন্য জানলার পরদাটা একটুও নড়েনি। দুটো জানলাই খোলা, দুটো জানলা দিয়েই তো সমান হাওয়া আসার কথা।

বাইরে কিছুই দেখা যায় না। এমন হতে পারে, অন্য জানলাটার কাছেই কোনও বড় গাছ আছে কিংবা দেওয়াল আছে, তাই হাওয়া বাধা পাচ্ছে। এ ছাড়া আর তো কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এইসব কথা ভাবলেও সত্যি কথা বলছি, বেশ ভয় করতে লাগল।

এখন আর বই পড়া যাবে না। দুটো জানলায় ভাল করে ছিটকিনি এঁটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরেই মনে হল, জানলায় কেউ ঠক্ ঠক্ করছে।

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, কেউ না। কেউ না। ওটা ঝড়ের শব্দ বাতাসের ধাক্কা। তাছাড়া আর কিছুই নয়।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় সেই প্রথম জানলাটার পাল্লা খুলে গেল হাট করে, ঝোড়ো বাতাস ঘরের মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু করে দিল। ঝনঝন শব্দে পড়ে ভেঙে গেল দেওয়ালের ছবিটা।

আমি দারুণ ভয়ে আঁ-আঁ চিৎকার করে উঠলাম।

অন্য জানলাটায় একটুও শব্দ নেই, বাতাসের ঝাপটা নেই। তা হলে এ নিশ্চয়ই অলৌকিক কাণ্ড!

শঙ্কর নেই, তবে কি তার প্রেতাত্মা দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে? অর্থাৎ, ভূত!

এতকাল ভূতে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন ভয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। সত্যিই মনে হচ্ছে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেড সুইচটা টিপে আলো জ্বালাতেই অবশ্য দেখা গেল, ঘর খালি। কেউ নেই, এলোমেলো বাতাস বইছে শুধু। ছবিটা পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

এবার আমি ঠাস করে নিজের গালে একটা চড় মারলাম।

যদি শঙ্কর ভূত হয়ে এসেও থাকে, তাতে আমার ভয় পাওয়ার কী আছে? শঙ্কর আমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিল, সে কি আমার কোনও ক্ষতি করবে? কখনও না।

ছেলেমানুষের মতন ভয় না পেয়ে আমার ধৈর্য ধরে দেখা উচিত। ভূত আছে না নেই, তার প্রমাণ হয়ে যাবে। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূত হলে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। তার কাছ থেকে ভূতেদের ব্যাপার-স্যাপার সব জেনে নেওয়া যাবে।

নিজেকে চড় মারার ফলে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম। খুলে দিলাম দুটো জানলার পাল্লা। আসুক হাওয়া। আরও যদি কেউ আসতে চায় তো আসুক।

বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম বইটা নিয়ে! জোরে বললাম, শঙ্কর আয়, দেখা দে। কিংবা যদি কিছু বলতে চাস, বল। আমি ভয় পাব না। তোর যেরকম চেহারাই হোক, ভয় পাব না। আয় শঙ্কর, আয়, তোর সঙ্গে আমার অনেক গল্প বাকি আছে।

তারপর মাঝে মাঝে বই পড়া আর মাঝে মাঝে জানালার দিকে তাকানো, এইভাবে কেটে গেল সারারাত। চেয়ারে বসে। কেউ এল না। কেউ কিছু বলল না! শঙ্কর দেখা দিল না।

দুর্গের মত সেই বাড়ীটা

কেউ আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। অথচ আমি, কি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবো?

ব্যাপারটা একটা বাড়ী নিয়ে!

এই বাড়ীটা আমি প্রথম যখন দেখি, তখন আমার বয়েস ছিল বারো। বয়েজ স্কাউট থেকে আমরা ক্যাম্প করতে গিয়েছিলাম গঙ্গানগরে। তিন দিন পরে দারুণ হৈ চৈ হয়েছিল সেখানে।

তারই মধ্যে একদিন বিকেলবেলা ছিল আমাদের 'যেদিকে খুশি যাও' প্রোগ্রাম। সবাইকে একা একা আলাদা যে-কোনো দিকে চলে যেতে হবে, ফিরতে হবে ঠিক দু'ঘন্টা পরে। দু'ঘণ্টা পাঁচ মিনিটের বেশি দেরী হলেই শাস্তি। আর ফিরে এসে সেদিন রাত্তিরের ক্যাম্প ফায়ারে বলতে হবে সেদিনের অভিজ্ঞতা।

অনেকে বানিয়ে বানিয়ে কত রকম গল্পই যে বলেছে! একজন নাকি গঙ্গাসাগরের কাছেই বাঘের পাল্লায় পড়েছিল। একজন দেখেছিল একটা পাইথন। দু'জন পড়েছিল ডাকাতের পাল্লায়। গুলতাপ্পি মারার ব্যাপারে

করার উপায় নেই। আমি ছুট দিলাম ক্যাম্পের দিকে।

সে রাত্রে ক্যাম্প ফায়ারে আমি শুনিয়েছিলাম ঐ বাড়ীটির কথা।

তখন আমি ডাইরি লিখতাম, তাতেও ঐ অভিজ্ঞতার কথা লিখবো ভেবেছিলাম।

এর পর দশ বছর কেটে গেছে।

আমি কলকাতা থেকে বাসে যাচ্ছিলাম শিলিগুড়ি। হঠাৎ এক সময়ে চমকে উঠেছিলুম।

তখন প্রায় সন্ধ্যে। এদিকের রাস্তা ভেঙে নতুন করে সদ্য চওড়া করা হয়েছে। আমি বসেছিলাম জানালার ধারে।

এক সময় চমকে উঠে দেখি, রাস্তার ঠিক পাশেই সেই দুর্গের মতন বাড়ীটা। সেই দুটো গম্বুজের মাথায় ঘড়ি রয়েছে। গেটের পাশে অবশ্য বন্দুকধারী প্রহরী নেই।

এ বাড়ীর এত কাছ দিয়ে তো রাস্তা ছিল না। এখানে ছিল বাগান। সেই বাগান কোথাও উধাও হয়ে গেছে, এখন সেখানে রাস্তা। গম্বুজ দুটোও অনেকটা ভাঙা ভাঙা। দূরে বাড়ীটাকেও বেশ জরাজীর্ণ মনে হলো।

চলন্ত বাস থেকে আর কতখানিই বা দেখা যায়! একটু বাদেই বাড়ীটা মিলিয়ে গেল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। মাত্র দশ বছর আগেও বাড়ীটা কত টাটকা ছিল।

কিন্তু দুঃখ করেই বা কী হবে! এখন জমিদারের দিন চলে গেছে? এসব বড় বড় বাড়ী টিকিয়ে রাখাই শক্ত ঐ রকম কত বাড়ী এখন হাসপাতাল বা কলেজ হয়েছে।

তারপর আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে।

আমি গিয়েছিলাম কোচবিহারে। সেখান থেকে একটা বাসে এলাম নিউ জলপাইগুড়ি। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরবো। হঠাৎ ঘোষণা শোনা গেল যে কিছু দূরে রেল লাইনে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সে রাতে আর দার্জিলিং মেল যাবে না।

মহা মুস্কিল! অথচ সে রাতে আমায় কলকাতায় ফিরতেই হবে।

তক্ষুণি চলে এলুম শিলিগুড়ি। সেখান থেকে রকেট বাস তক্ষুণি ছাড়লে, ঝট্ করে উঠে পড়লুম।

রকেট বাস চলে সারা রাত ধরে। যাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে আছে। আমিও খানিকবাদে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। দেখি সে বাসটা থেমে আছে রাস্তার পাশে।

কী ব্যাপার?

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, ড্রাইভার কণ্ডাক্টার নেমে ঘোরাঘুরি করছে। বাসটা খারাপ হয়ে গেছে।

আমিও নেমে পড়লুম। গায়ে হাতে পায়ে ব্যাথা হয়ে গেছে। সেই আড়ষ্টতা কাটাবার জন্য দু'এক পা এগিয়েছি। হঠাৎ দেখি সামনে একটা গম্বুজের মাথায় ঘড়ি।

আরে, এতো সেই বাড়ীটা!

পাশাপাশি দুটো গম্বুজই রয়েছে, ঘড়ি দুটোও চলেছে। দূরে সেই বাড়ীটা।

আমি গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে প্রহরী নেই, কেউ নেই। একটু ঠেলা দিতেই গেটটা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকবো কি না ভাবছি, এমন সময় একটা হ্যারিকেন নিয়ে এগিয়ে এলো একটা লোক। ধুতি আর পাঞ্জাবী পরা।

লোকটি কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

আমি বললুম, আমাদের বাস খারাপ হয়ে গেছে। তাই একটু ঘোরাঘুরি করছি।

লোকটি বললেন ও তাই আওয়াজ শুনলাম বটে। সেই আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল!

আমার মনে হলো, এই লোকটিকেই কি আমি পনেরো বছর আগে দেখেছিলুম? হতেও পারে। ভদ্রলোকের বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি।

ভদ্রলোক বললেন, এই শীতের রাতে আপনাদের বাস খারাপ হয়ে গেল, আপনাদের তো খুবই অসুবিধে হচ্ছে।

আমি বললুম, যা মনে হচ্ছে, সারারাতেও ঠিক হবে কিনা ঠিক নেই।

ভদ্রলোক বললেন, আপনারা ভেতরে এসে বিশ্রাম নিন না। আমাদের অতিথিশালা আছে, সেখানে অনায়াসেই চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক থাকতে পারে।

আমি বললুম, তাই নাকি?

উনি বললেন, বাসের অন্য যাত্রীদের ডাকুন!

আমি ফিরে গিয়ে বাসের যাত্রীদের ডাকাডাকি করে ঐ কথাটা বললুম। কেউ কোনো সাড়া দিল না। কেউ বাস থেকে নামলো না। ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকালো আমার দিকে।

তখন আমি একাই ফিরে গেলুম। ভদ্রলোক হ্যারিকেন নিয়ে তখনো দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি বললুম, কেউ আসতে চাইলো না।

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর বললেন, আমাদের এতবড় অতিথিশালা পড়ে আছে, আজকাল কেউ আসে না। আপনি একাই আসুন, তা হলে!

আমি বললুম, একা যাবো! যদি হঠাৎ বাসটা ছেড়ে যায়?

উনি বললেন, আপনাকে না নিয়ে যাবে, তা কি হয়! আসুন, ভেতরে এসে এক কাপ চা খেয়ে যান।

ভদ্রলোক এমন আন্তরিক ভাবে ডাকলেন যে আমি আর না বলতে পারলুম না। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলুম।

তারপর বললুম, জানেন, আমি ছোটবেলায় অনেক বছর আগে আপনাদের এই বাড়ীটা দেখতে এসেছিলুম।

উনি বললেন, তাই নাকি? তখন জমজমাট ব্যাপার ছিল, এখন আর কিছুই নেই। এ বাড়ীতে লোকই নেই তেমন। বলতে গেলে আমি একাই টিকে আছি।

আমি বললুম আপনাদের একটা অস্ত্র ঘর আছে শুনেছিলাম। সেটা সেবার দেখা হয়নি। সেই অস্ত্রগুলো এখনো আছে?

উনি বললেন, হ্যাঁ, কোনক্রমে রেখে দিয়েছি আমি। আপনি দেখবেন?

—হ্যাঁ।

আসুন তা হলে।

ভদ্রলোক আমায় নিয়ে উঠে এলেন দোতলায়। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় ঠেলা দিলেন। কোনো তালা ছিল না দরজায় আপনি খুলে গেল।

হ্যারিকেনের আলোয় দেখলুম ভেতরে সাজানো রয়েছে অনেক তলোয়ার, বন্দুক, ছুরি, রিভলবার, ঢাল বর্ম।

উনি বললেন, ঐ যে বড় বাঁকা তলোয়ারটা দেখছেন, ঐটা শিবাজীর তলোয়ার। আমার ঠাকুর্দা ওটা কিনে এনেছিলেন লণ্ডন থেকে।

আমি চমকে উঠে বললুম, তাই নাকি? তা হলে তো একটা অমূল্য জিনিস।

ঘরের মধ্যে ঢুকে তলোয়ারটা ভালো করে দেখতে গেছি, এমন সময় বাইরের গম্বুজের ঘড়িতে পরপর পাঁচবার ঘন্টা বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল খুব জোরে বাসের হর্ন।

আমি বললুম, এই রে বাস ছেড়ে যাচ্ছে।

তখুনি দৌড় মারার জন্য তৈরী হয়ে বললুম, আজ ভালো করে দেখা হলো না একদিন আসবো, অ্যাঁ?

ভদ্রলোক ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বললেন, আসবেন।

আমি প্রাণপনে দৌড়ে রাস্তায় এসে দেখলুম, বাসটা চলতে শুরু করেছে। উঠে পড়লুম একলাফে। কণ্ডাক্টর আমায় কিছুই বললো না।

একসময় পৌঁছে গেলুম কলকাতায়।

এর দু'দিন বাদে কফি হাউসে বন্ধুদের বললুম, জানিস গঙ্গানগরের কাছে একটি জমিদার বাড়ীতে দারুণ দামী জিনিস আছে। শিবাজির তলোয়ার লর্ড ক্লাইভের পিস্তল—দেখতে যাবি?

বন্ধুদের মধ্যে একজন খবরের কাগজে কাজ করে।

সে হো-হো করে হেসে উঠে বললো, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? গঙ্গানগরের কাছে জমিদার সিংহদের বাড়ীটার কথা বলছিস তো? সে বাড়ী তো গভর্নমেন্ট নিয়ে ভেঙে ফেলেছে গত মাসে। সেখানে অনেকগুলো ফ্ল্যাট বাড়ী হবে।

আমি রেগে উঠে বললুম, তোরা খবরের কাগজের লোকেরা যা শুনিস তাই বিশ্বাস করিস। মিলিয়ে দেখিস না আমি নিজের চোখে পরশুদিন দেখে এলুম।

তারপর এমন তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল যে অন্য বন্ধুরা থামতেই পারে না।

শেষ পর্যন্ত আর এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা গাড়ি যোগাড় করে আমরা তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লুম গঙ্গানগরের দিকে।

সেই ঘড়িওয়ালা গম্বুজ দুটোর পাশে বসে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। গম্বুজ দুটো আর লোহার গেটটা ঠিকই আছে। কিন্তু দুর্গের মতো বাড়ী নেই। সেখানটা একদম ফাঁকা!

সাংবাদিক বন্ধুটি বলল, দেখলি, বাড়ীটা ভেঙে ফেলা হয়েছে কিনা?

আমি ক্ষীণভাবে বলতে চাইলুম, পরশুদিনও ছিল বোধহয় তারপর ভেঙ্গেছে—।

বন্ধুটি বললো, ধ্যাৎ! অতবড় বাড়ী ভাঙতেই তো তিন চার মাস লাগে!

আমার সারা গা কাঁপতে লাগলো, দর দর করে ঘাম বেরিয়ে এলো।

সেদিন ভোর পাঁচটার সময় তাহলে আমি কি দেখলাম?

লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে। দূরে আলো পড়ে। সেই রকম জ্ঞানী গুনীদের নিকটের লোকেরা তাঁদের বুঝতে পারে না। দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

একটি লাল লঙ্কা

কাকাবাবু বললেন, "অসম্ভব! তোমার এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি এ-প্রসঙ্গ আর আমার কাছে বোলো না, অন্য কথা বলো!"

অরিজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কাকাবাবু, আমার যে আর অন্য কোনও উপায় নেই।"

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, "হ্যাঁ, উপায় আছে। তুমি এক্ষুনি চান করে নাও তারপর ভাল করে খাও-দাও, তারপর একটা লম্বা ঘুম দাও।"

অরিজিৎ আবার বলল, "কাকাবাবু, তুমি বুঝতে পারছ না..."

কাকাবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার আর বোঝার দরকার নেই।"

তারপর তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "সন্তু! সন্তু!"

সন্তু একটু আগেই ব্যাডমিন্টন খেলে ফিরেছে। কাকাবাবুর ঘরে একবার উঁকি মেরে ওপরের ঘরে চলে গেছে। কাকাবাবুর ডাক শুনে নীচে নেমে এল তরতর করে। মা-বাবা বেড়াতে গেছেন পুরী। বাড়িতে আর বিশেষ লোকজন নেই।

কাকাবাবুর ঘরে একজন ভদ্রলোককে দেখতে পেল সন্তু, মুখটা চেনা-চেনা। খুব সম্ভবত মধ্যপ্রদেশে কোথাও দেখা হয়েছিল। কিন্তু এখন তার মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। মাথার চুল ধুলোবালি মাখা, তার গায়ের প্যান্টশার্ট দোমড়ানো-মোচড়ানো, কেমন যেন পাগল-পাগল চেহারা।

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিৎকে চিনতে পারছিস তো, সন্তু? অরিজিৎ সিকদার। সেই একবার বক্সার জেলার নারাণপুরে এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুর মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক একজন বোটানিস্ট। সারা ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বিচিত্র সব গাছ খুঁজে বেড়ান। সেবারে তিনি বক্সার জেলার জঙ্গলে বুনো চা গাছ খুঁজছিলেন। অনেক জঙ্গলেই নাকি এরকম বুনো চা-গাছ আছে, চাষ করতে হয় না। নিজে-নিজেই জন্মায়, আগে কেউ তার সন্ধান রাখত না।

কিন্তু সেবার তো ভদ্রলোককে খুব শান্ত আর ভদ্র মনে হয়েছিল, হঠাৎ তাঁর এইরকম চেহারা হয় কী করে?

কাকাবাবু আবার বললেন, "দিল্লীতে আমার সঙ্গে কাজ করত সত্যেন, এই অরিজিৎ তার ভাইপো। ওকে অনেক ছোট বয়েস থেকে দেখছি, তখন থেকেই ও আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকে। অরিজিৎ আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবে, বুঝলি। ওর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বল রঘুকে, আর চান করার জন্য ওকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে।"

অরিজিতের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে তো কোনোও পোশাক নেই। তুমি আমারই একটা পাজামা, পাঞ্জাবী পরে নাও আজ।"

অরিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে একবার কাকাবাবু আর একবার সন্তুর দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তার এক হাতে একটা ছোট্ট টিনের কৌটো।

কাকাবাবু আলমারি খুলে পাজামা, পাঞ্জাবী বার করলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "অরিজিৎ, তোমার ওই কৌটোটা আমার কাছে রেখে যাও।"

অরিজিৎ হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে বলল, "না, এটা আমার কাছেই থাকবে।

কাকাবাবু বললেন, "তুমি চান করতে যাচ্ছ, ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি? ওটা আমার কাছেই থাক।"

অরিজিৎ কৌটোটা পেছন দিকে লুকিয়ে প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বলল, "না! এটা আমি কাউকে দিতে পারব না!"

তার চোখ দুটো এমন জ্বলছে যে, সেদিকে তাকালে গা ছমছম করে।

কাকাবাবু অবশ্য বিচলিত হলেন না। তিনি অরিজিতের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন, "দাও, দাও ওটা আমাকে।"

কাকাবাবুর ওইরকম গলায় আওয়াজ শুনে অনেক বাঘা-বাঘা বদমাশকেও ঘাবড়ে যেতে দেখেছে সন্তু। অরিজিৎ আর কিছু বলতে পারল না। কৌটোটা সে তুলে দিল কাকাবাবুর হাতে। তার হাতটা কাঁপছে।

কৌটোটার মধ্যে কী আছে, তা দেখার দারুণ কৌতুহল হল সন্তুর, কিন্তু কাকাবাবু সেটা খুলে দেখলেন না। রেখে দিলেন জামা-কাপড়ের আলমারিতে। তারপর এমনভাবে পেছন ফিরে একটা বই হাতে তুললেন যাতে তাঁর সঙ্গে আর কোনও কথা বলা না চলে।

সন্তু অরিজিৎকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল দোতলার বাথরুমটা! একটা নতুন সাবান আর তোয়ালে এনে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনি দাড়ি কামাবেন? কাকাবাবুর কাছ থেকে ব্লেড এনে দেব?"

অরিজিৎ রুক্ষভাবে বলল, "না, দরকার নেই!"

অরিজিৎ স্নান করল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে।

এর মধ্যে সন্তু দু'তিনবার কাকাবাবুর ঘরে উঁকি মেরেছে, যদি কৌটোটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়। কাকাবাবু একমনে বই পড়েই চলেছেন। এই সময় তাঁকে বিরক্ত করা সম্ভব নয়।

ঠিক আটটার সময় খাবার দিয়ে দেওয়া হল। কাকাবাবু বাড়িতে রুটি খান। সন্তু ভাত ভালবাসে। রঘু ভাত আর রুটি দু'রকম বেশি করে বানিয়েছে, তার সঙ্গে ডাল, বেগুনের ভর্তা আর মুরগির মাংস।

খাবার টেবিলে বসার পর কাকাবাবু অরিজিৎকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি রুটি খাবে, না ভাত?"

অরিজিৎ বলল, "ভাত! না, রুটি! থাক, ভাতই খাব। কিংবা, রুটি কি বেশি আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি দুটোই খাও।"

কাকাবাবু রুটি খান ঠিক তিনখানা। অরিজিৎ খেল আটখানা রুটি। তারপর সে ভাত নিল। সন্তু যতটা ভাত খায়, অরিজিৎ নিল তার তিন গুণ। রঘু তাকে ভাত দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে, সে না বলছে না।

সে এমনভাবে খাচ্ছে, যেন বহুদিন খেতে পায় নি। কিন্তু কয়েকদিন উপোস করলেও কি মানুষ একসঙ্গে বেশি খেতে পারে? অরিজিতের রোগা-পাতলা চেহারা। এরকম চেহারায় কোনও লোককে সন্তু কখনও এতখানি খেতে দ্যাখেনি।

সবটা ভাত শেষ করার পর অরিজিৎ আরও দু'টুকরো মাংস আর একটু ঝোল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর রুটি নেই?"

আর একখানা মোটে রুটি বাকি ছিল, রঘু সেটাই দিয়ে দিল।

কাকাবাবু এঁটো হাতে চুপ করে বসে অরিজিতের খাওয়া দেখলেন। তারপর বললেন, "এইবার গিয়ে একটা ঘুম দাও। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দিল্লিতে টেলিফোনে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাও?"

অরিজিৎ দু'দিকে শুধু মাথা নাড়ল।

হাত ধোয়ার পর অরিজিৎ কাকাবাবুর ঘরে এসে বলল, "এবার আমার কৌটোটা দিন, ওটা আমার ঘরে রাখব।"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা আমার কাছে থাকলে অসুবিধের কী আছে?"

অরিজিৎ বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন না, ওটা কোনওক্রমে নষ্ট হয়ে গেলে মহাক্ষতি হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে থাকলে নষ্ট হবে কেন? আমি গগন বোসের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি, কাল সকাল এগারোটায় জিনিসটা সায়েন্স কলেজে নিয়ে যাব।"

অরিজিৎ উত্তেজিতভাবে বলল, "সায়েন্স কলেজ! ওরা কিছু বুঝবে না। ওটা সুইডেনে পাঠাতে হবে। সেখানে এই ব্যাপার নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, সুইডেনে পাঠাবারই ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আজ রাত্তিরে আমার কাছে রাখতে তোমার এত আপত্তি কেন।"

"ওটা আমার জিনিস! আমি ছাড়া কেউ এর সন্ধান জানে না!"

"ওটা তোমার জিনিস, তা মানছি! কিন্তু আমাকে যদি তোমার এতই অবিশ্বাস, তা হলে ওটা নিয়ে আমার বাড়ীতে এসেছ কেন? আর এসেই যখন পড়েছ, তখন তোমাকে আমি মোটেই পাগলামির প্রশয় দিতে পারি না। জিনিসটা আমার কাছেই থাকবে।"

সন্তু আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু কৌটোর মধ্যে কী আছে?"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অরিজিৎকে বললেন, "আচ্ছা একটুখানি বসে যাও। তোমার ঘটনাটা সন্তুকে বলো। বারবার নিজের মুখে বললে এক সময় নিজেই তুমি বুঝতে পারবে যে, সবটাই বানানো। তোমার কল্পনা। হয়তো এরকম একটা ব্যাপার কখনও স্বপ্নে দেখেছো তারপর সেটাকেই সত্যি বলে ধরে বসে আছ। এরকম কিন্তু বাস্তবে হতে পারে না।"

অরিজিৎ একটা চেয়ারে বসে পড়ে মুখ গোঁজ করে বলল, "ও ছোট ছেলে, ও এসবের কী বুঝবে?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু ওর অভিজ্ঞতা কম নয়। তুমি যে-অঞ্চলটার কথা বলছ, সন্তু সেখানে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। সন্তু, সেই যে সেবারে আমরা নেপাল থেকে এভারেস্টের রুট ধরে গিয়েছিলাম, মনে নেই? সেই একটা অতি-মানবের দাঁতের খোঁজে?"

সন্তু বলল, "সে ঘটনা কখনও ভোলা যায়? উঃ কী শীত ছিল, তারপর সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে..."

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিতের ঘটনার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আমি তোকে বলে দিচ্ছি। অরিজিৎ তো বনে-জঙ্গলে নানারকম অদ্ভুত-অদ্ভুত গাছপালা খুঁজে বেড়ায়। এবারে সরকার থেকে ওকে পাঠানো হয়েছিল নেপালে। বারো-তেরো হাজার ফিট উঁচুতেও কিছু-কিছু গাছ জন্মায়। সেখানে নাকি কোথাও কোথাও এরকম স্ট্রবেরি গাছ দেখতে পেয়েছে কেউ-কেউ। অত ঠাণ্ডায় স্ট্রবেরি গাছ কী করে বেঁচে থাকে সেটাই ওর গবেষণার বিষয়। কী তাই তো?"

অরিজিৎ ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিৎ যে জায়গাটা বেছে নিয়েছিল সেখানে দু-একটা গ্রাম আছে, সেখানে ইয়েতিরা এসে মাঝে-মাঝে উপদ্রব করে বলে গুজব আছে।"

সন্তু হাসতে-হাসতে বলল, "আপনি একটু আগে যে অভিযানের কথা বললেন, সেবারে আমরা বেশ কয়েকটা ইয়েতি দেখেছিলুম, তাই না?"

কাকাবাবুও এবার একটু মুচকি হেসে ফেললেন।

অরিজিৎ বলল, "তোমরা ইয়েতি দেখেছিলে? সত্যি?"

সন্তু বলল, "এমন মেক-আপ দিয়েছিল যে, আসল না নকল, তা বোঝাই যায়নি অনেকক্ষণ?"

অরিজিৎ জিজ্ঞেস করল, "মেক-আপ দিয়েছিল মানে? সেজেছিল? কারা?"

কাকাবাবু বললেন, "সে অনেক লম্বা গল্প। সেটা পরে শুনে নিও। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ইয়েতি বলে খুব সম্ভবত কোন প্রাণী নেই।"

অরিজিৎ জোর দিয়ে বলল, "আলবাত আছে!"

"তুমি বললেই তো হবে না। এ পর্যন্ত কেউ কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। কত লোকই তো বলেছে যে, ইয়েতি দেখেছে নিজের চোখে কিন্তু কেউ একটা ছবি তুলতে পেরেছে?"

"ইয়েতির পায়ের ছাপ অনেকেই দেখেছে। মস্ত বড় পায়ের ছাপের ছবিও তোলা হয়েছে।"

"বরফের ওপর পায়ের ছাপ, সেটা আবার প্রমাণ নাকি? মানুষের পায়ের ছাপও বরফের ওপর কিছুক্ষণ বাদে অন্যরকম হয়ে যায়।"

"তবু আমি বলছি, ইয়েতি আছে।"

"না নেই! আমি নেপালে অন্তত তিন-চারজনের মুখে শুনেছি, তারা ইয়েতি দেখেছে। কিন্তু তাদের একটু জেরা করতেই তারা উল্টো-পাল্টা বলতে শুরু করেছে। কেউ বলে গেরিলার মতন দেখতে, কেউ বলে ভাল্লুকের মতন। আবার কেউ বলে, দশ-হাত লম্বা মানুষের মতন। তাদের দু' একজনের সঙ্গে ক্যামেরাও ছিল, তবু ছবি তুলতে পারেনি, তার কারণ নাকি ইয়েতিকে একপলক দেখার পরই অদৃশ্য হয়ে গেছে. যত্ত সব গাঁজাখুরি কথা! আসলে বরফের ওপর দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলে ক্লান্ত হয়ে অনেকে চোখে ভুল দেখে। মরুভূমিতে যেমন মানুষ মরীচিকা দেখে।"

কাকাবাবু, আসল ব্যাপারটা কিন্তু আপনিই ঠিক বলেছিলেন?

"তার মানে?"

"ইয়েতিরা অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"অরিজিৎ, এবার ঘুমোতে যাও। আবার কাল সকালে কথা হবে।"

"আমার কথাটা ভাল করে শুনুন, কাকাবাবু! আমিও তো বিজ্ঞান পড়েছি, কোনও প্রমাণ না পেলে একেবারে গাঁজাখুরি কথা আমি মেনে নেব কেন? নেপালের অন্তত দুটো পুরনো পুঁথিতে লেখা আছে, ইয়েতিদের হঠাৎ-হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্ষমতা আছে। আমি নিজেও তার প্রমাণ পেয়েছি। এইজন্যই ইয়েতির ছবি তোলা যায় না। মানুষের চোখের সামনে পড়ে গেলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"পুঁথিতে যা কিছু লেখা থাকে তা-ই সত্যি নয়।"

"বললাম যে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। এমনকী আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "অরিজিৎ বলতে চায়, হিমালয়ের কোনও একটা জায়গায় নাকি এক রকমের ফল পাওয়া যায়, যা খেলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ইয়েতিরা নাকি সেই ফল খায়। আমাদের অরিজিৎ সেই ফলের সন্ধান পেয়েছে। এমনকী নিজে সেই ফল খেয়েও দেখেছে!

অরিজিৎ ব্যাকুলভাবে বলল, "আপনি এখনও আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "এসব রূপকথার মতো গল্প, শুনতেই ভাল। কিন্তু বিশ্বাস করার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শোনো, জল জিনিসটা গরম হলে বাষ্প হয়, তারপর সেই বাষ্প উড়ে যায়। এমনকী অনেক ধাতুকেও প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়ে বাষ্প করা যায়, আবার ঠাণ্ডা হলে সেই ধাতু বা জল ফিরে আসে। কিন্তু কোনও জীবন্ত প্রাণীকে বেশী গরমে রাখলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সেই ছাইটাইকে ঠাণ্ডা করলে কিন্তু সেই প্রাণীটাকে ফেরত পাওয়া যাবে না। কোনও জীবন্ত প্রাণী, এমনকী একটা পিঁপড়েকেও অদৃশ্য করে আর ফিরিয়ে আনা অসম্ভব!"

সন্তু আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু কাকাবাবু, বৈজ্ঞানিকরা টাইম-

মেশিনে কি মানুষকে অদৃশ্য করতে পারবে না? স্টার ওয়ার্স ফিল্মে দেখি, একটা যন্ত্রের মধ্যে দাঁড়ালে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার অন্য জায়গায় ফিরে আসছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব এ-যুগের রূপকথা। আগেকার গল্পে যেমন রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আকাশে উড়ে যেত এখানকার গল্পেও তেমনি নায়করা স্পেস-শিপে চেপে অন্য গ্রহে যায়, এমনকী এই গ্যালাক্সি পেরিয়ে গ্রীসে যুদ্ধ করে আসে। এসব রূপকথা ছাড়া কিছুই না।"

অরিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি যদি আপনার চোখের সামনে করে দেখাতে পারি? আমাকে কৌটোটা একবার দিন।"

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই সে ছুটে গিয়ে জামা-কাপড়ের আলমারিটা খুলে কৌটোটা বার করে এনে বলল, "আমি নিজে দু'বার এক্সপেরিমেন্ট করেছি। দু-বারই সাকসেসফুল।"

কৌটোটা খুলে সন্তুকে দেখাল।

ভেতরের জিনিসটা দেখে সন্তু খানিকটা নিরাশ হয়ে গেল। এটা তো একটা লঙ্কা। বেশ বড়সড় টাবাটোবা গোলগাল লাল লঙ্কা।

অরিজিৎ যেন তার মনে কথাটা বুঝতে পেরে বলল, "এটা লঙ্কা বলে মনে হচ্ছে তো? কিন্তু এটা এক ধরনের স্ট্রবেরি। এটা ঝাল নয় মোটেই, বরং টক-মিষ্টি। কাকাবাবু শুনলে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তোমাকে বলছি সন্তু, একেবারে সত্যি কথা বলছি! পাহাড়ে স্ট্রবেরি খুঁজতে খুঁজতে, ঝোপঝাড়ে যেখানে যে ফল দেখতাম, অমনি আমি তা খেয়ে স্বাদ নিতাম। কোনও বিষাক্ত ফল খেয়ে ফেলারও ঝুঁকি ছিল অবশ্য। একদিন আমি এই ফল একটা খেয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলুম!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ!"

অরিজিৎ বলল, "দেড়দিন সেই অবস্থান ছিলুম। সিংবোচি গ্রামে এসে ঘুরেছি, লোকজনের মধ্যে, কিন্তু কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম খুব। পরে ওইরকমই আর একটা ফল খেয়ে নেবার পর আবার সব ঠিক হয়ে গেল।"

সন্তু একবার কাকাবাবু আর একবার অরিজিতের দিকে তাকাল। তারপর কৌটোটা হাতে তুলে নিল।

অরিজিৎ বলল, "দারুণ ভাল লাগে সেই সময়টা। কোনও খিদে-তেষ্টা থাকে না। দারুণ হালকা লাগে শরীরটা, মানে, শরীরটা অন্য কেউ দেখতে না পেলেও সেটা তো থাকেই। মনটা খুব ফুরফুর করে। যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়া যায়! কতরকম মজা হয়।"

কাকাবাবু বিদ্রূপের সুরে বললেন, "ইয়েতির গায়ে তো পোশাক থাকে না। মানুষের গায়ে যে প্যান্ট-জামা-জুতো থাকে, সেগুলোও অদৃশ্য হয়ে যায়?"

অরিজিৎ বলল, "দেখবেন? দেখবেন? এক্ষুনি দেখাব? আমি টপ করে ফলটা খেয়ে নেব, তারপর এক মিনিটের মধ্যেই আপনাদের চোখের সামনেই মিলিয়ে যাব! ওটা দাও তো সন্তু!"

অরিজিৎ হাত বাড়াতেই কাকাবাবু প্রায় গর্জন করে ওঠে বললেন, "না! কোনও দরকার নেই!"

অরিজিৎ এবার হেসে বলল, "কাকাবাবু, আপনি ভয় পাচ্ছেন? আপনি অবিশ্বাস করবেন, আবার ভয়ও পাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরকম অচেনা ফল খাবার দরকার নেই!"

অরিজিৎ বলল, "দারুণ ভাল লাগে। দেখলেই খেতে ইচ্ছে হয়। আমি মাত্র তিনটে পেয়েছিলুম, যদি আরও খুঁজে বার করা যায়, তা হলে একটা বিরাট আবিষ্কার হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, কৌটোটা আলমারিতে রেখে দে। এবার তোমরা শুতে যাও। আর কোনও কথা নয়। যাও। আমার ঘুম পেয়েছে।"

সন্তু অনিচ্ছার সঙ্গে কৌটোটা রেখে দিল যথাস্থানে। কাকাবাবু এমনভাবে চেয়ে আছেন যে, "বেরিয়ে যেতেই হল দুজনকে।"

অরিজিৎ সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "সন্তু, আমি কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাইনি। সত্যি ওই ফলটার অদ্ভুত গুণ আছে। ওটা খেলে মানুষ অদৃশ্য হতে পারে। কাকাবাবু বিশ্বাস করলেন না।"

অরিজিৎকে তার ঘর দেখিয়ে দেবার পর সে শুয়ে পড়ল। সে সত্যিই খুব ক্লান্ত, একটু বাদেই তার নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।

সন্তু উঠে গেল তিনতলায়। বড় হবার পর সে এই ছাদের ঘরটা নিজের জন্য পেয়েছে। এখানে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনো করতে পারে। মাঝে মাঝে ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখে।

একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেও তার মন বসল না পড়ায়। অরিজিতের কথাগুলোই মনে পড়ছে বারবার।

ছেলেবেলা থেকেই সন্তু অদৃশ্য হবার স্বপ্ন দেখছে। অদৃশ্য হতে পারলে সত্যি একটা মজার ব্যাপার হয়। তাকে কেউ দেখতে পাবে না, অথচ সে সবাইকে দেখতে পাবে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'অদৃশ্য মানুষ' নামে একটা বই পড়ে সন্তুর এক সময় মনে হয়েছিল সত্যিই ওই রকম একজন অদৃশ্য মানুষ আছে। কিন্তু কাকাবাবু বললেন, "বিজ্ঞানের দিক থেকেও নাকি অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব। অথচ অরিজিতের কথা শুনে মনে হয় না যে, সে আগাগোড়াই মিথ্যে কথা বলছে।"

খাওয়ার সময় অরিজিৎ অতগুলো খাবার খেল। সে বলল, "অদৃশ্য হলে নাকি খিদে-তেষ্টাও পায় না। অদৃশ্য অবস্থা থেকে আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরে এলে তখন একসঙ্গে দু-তিন দিনের খিদে পায়।"

বই পড়াতেও মন নেই, ঘুমও আসছে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে সন্তু। ঘড়িতে দেখল রাত দেড়টা বাজে।

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সন্তু। মনে হয় সারা কলকাতাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথায়ও কোন শব্দ নেই।

পা টিপে-টিপে দোতলায় নেমে এল সে। অরিজিৎ প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকছে। কাকাবাবুরও নাক ডাকার বেশ শব্দ হয়। সারা বাড়ীতে এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

কাকাবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। কাকাবাবুর এই এক স্বভাব প্রায়ই আলো জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়েন। মা, বাবা কিংবা সন্তু কেউ একজন পরে এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে যায়। আজ বাড়ীতে মা-বাবাও নেই।

সন্তু কাকাবাবুর ঘরের দরজাটা ঠেলে ঢুকল। কাকাবাবু টের পেলেন না। ঘরের মধ্যেও কয়েক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু, তার খুব লোভ হচ্ছে. ফলটা খেয়ে দেখলে কী হয়? কাকাবাবু রাগ করবেন? অরিজিৎ বলেছিল, অদৃশ্য হলেও সেই অবস্থায় দেড় দিনের বেশি থাকা যায় না। দেড় দিন পরেই তো সব ঠিক হয়ে যাবে। কাকাবাবু অরিজিতের কথায় বিশ্বাস করেননি, সন্তুর কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন।

আলমারি খুলে সন্তু কৌটোটা বার করল। কাঠের আলমারির পাল্লায় ক্যাঁচ করে সামান্য শব্দ হলেও কাকাবাবু জাগলেন না। সন্তু টপ করে আলো নিভিয়ে, দরজা ভেজিয়ে দৌড়ে উঠে এল ছাদে।

যা থাকে কপালে, খেয়েই দেখা যাক!

সন্তু ঝাল খেতে পারে না বেশি। ফলটাকে লঙ্কার মতন দেখতে একেবারে টকটকে লাল। যদি এটা লঙ্কা হয়, তা হলে দারুণ ঝাল হবে। সন্তু প্রথমে একটা ছোট্ট কামড় দিল। না, ঝাল নয়, একটু মিস্টি মিস্টিই। খানিকটা পিপারমেন্টের মতন। খেতে ভাল লাগছে।

পুরো ফলটাই খেয়ে ফেলল সন্তু, কিন্তু কিছুই তো হল না। তাহলে কি অরিজিৎ একদম বাজে কথা বলেছে? ওহো, আজ তো ১লা এপ্রিল! অরিজিৎ কাকাবাবুকে আর সন্তুকে এপ্রিল ফুল করেছে নির্ঘাত।

একটা কিসের শব্দ হতেই সন্তু ঘুরে তাকাল।

ছাদের পাঁচিলে কার যেন একটা কালো রঙের মাথা। ওটা কি কোনও মানুষ, না জন্তু?

সন্তু দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করেও পারল না। তার আগেই মাথাটা যেন বোঁবোঁ করে ঘুরতে লাগল, কানে ভোঁভো শব্দ হল, সে ঝুপ করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

সদ্য বরফ গলতে শুরু করেছে বলে পাথর এখানে সাংঘাতিক পিছল। কাকাবাবু প্রতিবার ক্রাচ তুলছেন আর ফেলছেন দারুন সাবধানে। তবু এক-একবার হড়কে যাচ্ছে।

অরিজিৎ করুণ মুখ করে বলল, "কাকাবাবু, আপনাকে আর যেতে হবে না। এরপর ওপরটায় গিয়ে আমি খুঁজে দেখছি।"

কাকাবাবু কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন। এখন ঘড়ি অনুযায়ী দুপুর সাড়ে তিনটে, কিন্তু এর মধ্যেই যেন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আকাশের এক দিকটা লাল।

এই ঠাণ্ডাতেও কাকাবাবুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। তাঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। কাঠমাণ্ডুতে তাকে দু-তিনজন বারবার অক্সিজেন সঙ্গে নেবার কথা বলেছিল, কাকাবাবু তাতে কর্ণপাত করেননি। তিনি ভেবেছিলেন,

আজকাল তো অক্সিজেন ছাড়াই কেউ কেউ এভারেস্টেও ওঠার চেষ্টা করেছে, সুতরাং এই বার-তের হাজার ফিটে কী আর কষ্ট হবে! কাকাবাবু নিজেও এর চেয়ে উঁচুতে উঠেছেন আগে। কিন্তু এবারে তাঁর হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন বাতাস কমে গেছে এদিকে।

অরিজিৎ আবার বলল, "কাকাবাবু, আপনি এখানে বসেই বিশ্রাম নিন বরং। আমি ওপর দিকটা দেখে আসছি। আগেরবার এখানেই পেয়েছিলাম।"

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, "না, আমি শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই! তুমি আমাকে এত দূর নিয়ে এসেছ, এইটুকু আর বাকি থাকে কেন?"

অরিজিৎ বললেন, "আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আগেরবার এই জায়গাতেই পেয়েছি ওই ফল।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য।"

চতুর্দিকে সাদা বরফের টোপর-পরা পাহাড়ের চূড়া। মাঝে মাঝে ঘাসের চাপড়া ছাড়া বড় গাছ আর এদিকে নেই। এদিককার শেষ গ্রাম নাংপো থেকে ওরা বেরিয়েছে সকাল ছ'টায়। সারা দিনে এক বারও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি।"

এই নিয়ে তিন দিন কেটে গেল এই অঞ্চলে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও দেখা যায়নি সেই লাল লঙ্কার মতন ফলের গাছ।

দু'জন মাত্র শেরপাকে সঙ্গে আনা হয়েছে। আং রেশিং আর ছোটা দাজু। কাকাবাবু তাঁর পুরনো বন্ধু মিমোকে খোঁজ করেও পাননি, সে চলে গেছে অন্য কোন অভিযাত্রীদের সঙ্গে।

আং শেরিং আর ছোটা দাজু দারুণ তেজি আর শক্তিশালী, কিন্তু তারা একটি কাস্তের মতন পাহাড়টায় কিছুতেই উঠতে চায় না। তাদের ধারণা, এই পাহাড়টায় অপদেবতা আছে। খানিকটা নীচে তারা থেকে গেছে।

শোঁশোঁ করে হাওয়া বইতে শুরু করে দিল। অরিজিৎ আরও কাঁচুমাচুভাবে বলল, কাকাবাবু, আজকে আর থাক, আবার কাল চেষ্টা করা যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এতখানি উঠেছি যখন, এ-পাহাড়টা আজ দেখা শেষ করতেই হবে! চলো আর দেরী করে লাভ কী?"

"অন্ধকার হয়ে গেলে আর কিছু দেখা যাবে না।"

"আমার কাছে টর্চ আছে। তুমি জানো না অরিজিৎ, সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে আমি আজকাল কোথাও যাই না। এবার সন্তুর জন্য আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।"

"কাকাবাবু, সন্তু যে এরকম একটা কাণ্ড করবে, আমি ভাবতেই পারিনি।"

"আলমারিটায় তালা না দিয়ে আমি ভুল করেছি। আসলে আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিনি, গুরুত্বও দিইনি। এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

সেই রাতের পর থেকে সন্তুকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছাদের ওপর পড়ে ছিল কৌটোটা, তার মধ্যে লাল লঙ্কার মতন ফলটাও নেই। অরিজিৎ তো দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। তার ধারণা সন্তু সেই ফলটা খেয়ে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কাকাবাবু সন্তুর ঘর এবং ছাদে প্রায় প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখেছেন। সন্তুর হঠাৎ চলে যাওয়ার কোনও চিহ্নই নেই। সে পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে ছিল, তার চটি জোড়া পর্যন্ত রয়ে গেছে, বিছানার ওপর একটা বই আধ-খোলা। সন্তু কোনও কারণে হঠাৎ কোথাও চলে গেলে নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে চিঠি লিখে রেখে যেত কিংবা কিছু একটা চিহ্ন রেখে যেত। সেরকম কিছুই নেই।

তবে, সন্তু যে এই লাল ফলটা চুপিচুপি খেয়েছে, তাও তো ঠিক। সে সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেল?

অরিজিৎ এখন বলছে, যে, অদৃশ্য মানুষদের নাকি কথা বলারও ক্ষমতা থাকে না। কিংবা তাদের কথা কেউ শুনতে পায় না। সে নিজে যেবার অদৃশ্য হয়েছিল, সেবার গ্রামের মানুষদের কাঁধে হাত দিয়ে ডেকেছিলাম, তাও তারা বুঝতে পারেনি কিছুই। অদৃশ্য ছোঁয়াও টের পাওয়া যায় না।

এইসব কথা শুনেই রাগে কাকাবাবুর গা জ্বলে।

দু'দিন অপেক্ষা করেও সন্তুর কোনও খোঁজ না পেয়ে কাকাবাবু উতলা হয়ে উঠেছিলেন। তা হলে কি অরিজিতের কথাই ঠিক? সন্তু একেবারে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন তিনি জেদ ধরলেন, তিনি নিজে ওই ফল একটা খেয়ে দেখবেন। সন্তু একটা ফল খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এরকম একটা অদ্ভুত কথা তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের কিংবা পুলিশ-বন্ধুদেরও বলতে পারেনি। তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবতেন, কাকাবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

পরের দিনই টিকিট কেটে কাঠমাণ্ডু। তারপর গাড়িতে অনেকটা পথ আসার পর শুরু হয়েছে পায়ে হাঁটা।

আং শেরিং আর ছোটা দাজুকে প্রথমে আসল উদ্দেশ্যটা বলা হয়নি। কাকাবাবু বলেছিলেন তিনি সিলভার লেপার্ডদের ছবি তুলতে চান। পৃথিবীতে

শুধু এই অঞ্চলটাতেই রুপোলি নেকড়েদের কদাচিৎ দেখা পাওয়া যায়। কাঠমাণ্ডুতেও তিনি এই কথা বলেই অভিযানের অনুমতি জোগাড় করে এনেছিলেন।

এই কাস্তের মতন পাহাড়টার কাছে এসে আং শেরিং বলেছিল, "সাহেব, এখন তো সিলভার লেপার্ড পাবেন না। এখানে অপদেবতারা আসে, এখানে অন্য কোনও জন্তু-জানোয়ার থাকে না। সিলভার লেপার্ড খুঁজতে গেলে আরও হাজার ফিট উঁচুতে উঠতে হবে।"

তখন কাকাবাবু অন্য কিছু বলতে বাধ্য হলেন। তিনি সরাসরি ইয়েতির প্রসঙ্গ না তুলে বলেছিলেন, "আমি একটা লাল লঙ্কার মতন ফল খুঁজছি, যা অনেক ওষুধ হিসেবে কাজে লাগে!"

সেই কথা শুনেই আং শেরিং আর ছোটা দাজু একসঙ্গে ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল, "বিষফল! বিষফল!"

কাকাবাবু অনেক কষ্টে তাদের কাছ থেকে আরও খবর জেনেছিলেন। ছোটা দাজুর বয়েস কম, সে কখনও ওই ফল দ্যাখেইনি। পাহাড়ে ওই ফল খুব কমই দেখা যায়। আং শেরিং বলেছিল, সে ওই ফল দুবার মাত্র দেখেছে। তেরো হাজার ফিটের কাছাকাছি উচ্চতায় ওই ফলের গাছ জন্মায় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সেই ফল প্রথমে থাকে কালো, তারপর লাল হবার আগেই কারা যেন তুলে নেয়। ওরকম লাল ফল খুব কমই দেখা যায়। সকলেই ধারণা, ওই লাল লঙ্কার মতন ফলগুলো অবদেপতাদের খুব প্রিয় খাদ্য।

আং শেরিং আরও একটা রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তাদের গ্রামের দুটি ছেলে একবার এই কাস্তে পাহাড়ের (এরা বলে সরু চাঁদের পাহাড়) ওপরে গিয়ে ওইরকম দুটো বেশ লাল ফল দেখে খেয়ে ফেলেছিল। তারপর তাদের চেহারা বদলাতে শুরু করে, তাদের সারা গায়ে বড় বড় লোম গজিয়ে ওঠে, চেহারাটা হয়ে যায় বাঁদরের মতন, তারা লাফাতে লাফাতে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে ওরা সবাই ওই রকম লাল ফল কখনও দেখতে পেলেও হাত দিতে সাহস করে না।

এই ঘটনা শুনে অরিজিৎ গোল গোল চোখে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিল। তবু কাকাবাবুর বিশ্বাস হয়নি। ওই ফল নিজে খেয়ে দেখার ইচ্ছে তাঁর মনে আরও জোরালো হয়েছিল।

আং শেরিং আর আসতে চায়নি, তবু কাকাবাবু চূড়া পর্যন্ত উঠে দেখতে চান।

আকাশের রং ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে, এরপর নীচে নামতে আরও বেশি অসুবিধে হবে। তবু কাকাবাবু আস্তে আস্তে ক্রাচ ফেলে ওপরে উঠছেন।

একটু পরে অরিজিৎ বলল, "কাকাবাবু, আমায় ক্ষমা করুন। আমার ভুল হয়েছে। ওই যে পাশের পাহাড়টা দেখুন। এখান থেকে ওটাকেও ঠিক কাস্তের মতন মনে হচ্ছে, আমি ওই পাশের পাহাড়টাতেই ফলগুলো পেয়েছিলুম।"

কাকাবাবু থেমে কয়েকবার জোরে-জোরে নিশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন, "তোমার আর কিছু ভুল হয়নি তো? তুমি ওই লাল ফল নিজে কি সত্যি খেয়েছিলে?

অরিজিৎ বলল, "নিশ্চয়ই। আপনার কাছে কি আমি মিথ্যে কথা বলব? তাছাড়া এরকম একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা না হলে আপনার কাছে আমি এত দূর থেকে ছুটে যাবই বা কেন।"

কাকাবাবুর একদিকে কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা, অন্য দিকের কাঁধে রাইফেল। তিনি দুটোই নামিয়ে রাখলেন। তারপর ওভারকোটের পকেট থকে একটা ছোট ফ্লাস্ক বার করে এক ঢোঁক গরম চা খেলেন।

হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে একটা ক্রাচ তুলে বললেন, "ওটা কী দ্যাখো তো অরিজিৎ!"

একটা অতিকায় কচ্ছপের মতন দেখতে পাথরের খাঁজে টমাটো গাছের মতন একটা গাছ উঁকি মারছে। তাতে ফল আছে ক্যাপসিকামের মতন একটা লাল লঙ্কা।

সেদিকে তাকিয়ে অরিজিতের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল! সে কোনক্রমে বলল, "এই তো, এই তো।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কথায় এইটুকু বিশ্বাস করা গেল যে, এত উঁচু পাহাড়েও ওইরকম লঙ্কার মতন ফল দেখা যায়। বেশ ভাল কথা। এবার ওটাকে ছিঁড়ে আনো। আমি খেয়ে দেখব।"

অরিজিৎ আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "না, না। কাকাবাবু, আপনি খাবেন না। সন্তুর জন্য নিয়ে চলুন।"

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই একটু দূরে খুব জোরে একটা হা-হা-হা শব্দ হল। কোনও জন্তু যেন খুব যন্ত্রনায় কাঁদছে।"

কাকাবাবু ফ্লাস্কটা পকেটে ঢুকিয়ে রাইফেলটা তুলে নিলেন।

অরিজিৎ বলল, "কাকাবাবু, চলুন, পালাই! কে যেন আসছে।"

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "ওই ফলটা না নিয়ে আমি যাব না। যে আসে আসুক!"

অরিজিৎ কাকাবাবুর হাত ধরে টানতে যেতেই কাকাবাবু এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিলেন। তারপর লাল ফলটা ছিঁড়ে নেবার জন্য একটু এগোতেই দেখলেন, মাত্র আট-দশ ফিট দূরে একটা প্রাণীর মুখ। সেটা ভাল্লুক কিংবা শিম্পাঞ্জীর হতে পারে, কোনও ক্রমেই মানুষের নয়।

কাকাবাবুর প্রথমে মনে হল, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার। কিন্তু রাইফেল নামিয়ে রেখে ক্যামেরাটা খুলে নিতে দেরী হয়ে যাবে। জন্তুটার চোখ দুটো অসম্ভব হিংস্র, সে এক পা, এক পা করে এগিয়ে আসছে।

কাকাবাবুর ছবি তোলার বদলে রাইফেল উঁচিয়ে জন্তুটাকে গুলি করতে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অরিজিৎ কাকাবাবুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "কাকাবাবু, গুলি করবেন না। ও আমাদের সন্তু! ও সন্তু!"

লোড করা রাইফেলে ঝাঁকুনি লেগে বেরিয়ে গেল। তার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। সেই লোমশ প্রাণীটা ভয় পাবার বদলে আরও সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের দু'জনের ওপর।

অরিজিতের কথা শুনেই কাকাবাবু দ্বিতীয়বার গুলি করতে পারলেন না। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু? তুই কি সন্তু?"

লোমশ প্রাণীটা কাকাবাবুকে এক ধাক্কা মারল। অরিজিৎকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল নীচের দিকে। সে গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল।

জন্তুটার ধাক্কায় কাকাবাবুও গড়িয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু এক জায়গায় থেমে যাবার পর বুঝলেন, তাঁর নিজের হাত-পা ভাঙেনি। কিন্তু অরিজিৎ তখনও গড়াচ্ছে।

তিনি চিৎকার করে বললেন, "আং শেরিং, ছোটা দাজু, ওকে ধরো।"

খানিকবাদে ছোটা দাজুর সাহায্য নিয়ে কাকাবাবু নীচে নেমে এলেন। আং শেরিং অরিজিৎকে কোলে নিয়ে বসে আছে। অরিজিতের জ্ঞান নেই, তার

মাথা কেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, খুব সম্ভবত একটা হাতের হাড়ও ভেঙে গেছে। জামা-টামা রক্তে মাখামাখি!

আং শেরিং শান্ত গলায় কাকাবাবুকে বলল, "সাহেব তোমাদের বলেছিলুম না, ওই অপদেবতার পাহাড়ে উঠো না। এক্ষুনি শহরের হাসপাতালে নিয়ে না গেলে এই সাহেবটা বাঁচবে না।"

পরের দিনই কাকাবাবু অরিজিৎকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন কাঠমান্ডুতে। কাকাবাবুর নিজেরও যে একটা হাত মচকে গেছে আর ডান দিকের কানের পেছনে অনেকটা জায়গা থেঁতলে গেছে, সে-কথা কাউকে বললেন না। অরিজিৎকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে তিনি সেখানেই বসে রইলেন সারারাত। ভোরবেলা অরিজিতের জ্ঞান ফিরেছে, আর তেমন বিপদের আশঙ্কা নেই শুনে কাকাবাবু ফিরে গেলেন হোটেলে।

সারা রাত জাগলেও সকালবেলা ঘুমোবার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবু ভাল করে স্নান করে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। তিনি কোনওদিন হার স্বীকার করেন না। তিনি মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছেন যে এর মধ্যে আবার তিনি ওই কাস্তে পাহাড়ে ফিরে যাবেন। ওই লাল লঙ্কার মতন একটা ফল তাঁর চাই-ই চাই! ওই ফল খাওয়ার পরের ফলাফল তিনি নিজে না বুঝলে সন্তুকে কিছুতেই খুঁজে বার করা যাবে না!

সবে মাত্র ব্রেকফাস্ট শেষ করেছেন, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। হাসপাতাল থেকে কোনও খবর এসেছে ভেবে তিনি রিসিভারটা তুলতেই অন্য দিকের গলার আওয়াজ শুনে আনন্দে তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল। "সন্তু"।

সন্তু বলল, "উফ, কাকাবাবু, এতক্ষণে আপনাকে পাওয়া গেল। আমি কাল দুপুর থেকে কাঠমাণ্ডুর সব হোটেলে আপনাকে খুঁজছি।"

কাকাবাবু উত্তেজনা দমন করে জিজ্ঞেস করলেন, সন্তু, তুই কোথা থেকে কথা বলছিস?

সন্তু বলল, "কলকাতা থেকে। আমাদের বাড়ী থেকে!"

"আমাদের বাড়ী থেকে! তুই তা হলে অদৃশ্য হয়ে যাসনি?"

"হা-হা-হা, কী যে বলেন। আপনিই না বলেছিলেন, মানুষের পক্ষে অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব।"

"তা তো বটেই। কিন্তু তোকে আমরা খুঁজে পাইনি কেন? তুই কোথায় গিয়েছিলি? তুই লাল লঙ্কাটা খেয়েছিলি না?"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু, আমি ভেবেছিলুম, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব। কিন্তু ওটা স্ট্রবেরিও নয়, লঙ্কাও নয়, ওটা একটা বিষাক্ত ফল। ওটা খেলে মাথা ঘুরে যায়, কান ভোঁ-ভোঁ করে, তারপর মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। অদৃশ্য-টদৃশ্য কিছু হয় না!"

"তা হলে তুই কোথায় ছিলি।"

"সেটা একটা মজার ব্যাপার। আপনার সেই ত্রিপুরার রাজকুমারের কথা মনে আছে? আপনার ওপর তার খুব রাগ! সে দুটো গুণ্ডা পাঠিয়েছিল আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। গুণ্ডা দুটো ড্রেন পাইপ বেয়ে উঠে এসেছিল ছাদে। তারা ভেবেছিল, আমাকে জোর করে, হাত-পা বেঁধে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা ধরবার আগেই আমি অজ্ঞান । ওরাই ঘাবড়ে গেল।"

কাকাবাবু একটুখানি চুপ করে গিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "তোর ভয় পাবার দরকার নেই, সন্তু। আসল ব্যাপার কী হয়েছিল বল তো?"

সন্তু বললো, "আমি আসল কথাটাই বলছি তো! রাজকুমার আমাকে বেঁধে নেবার জন্য দুটো লোক পাঠিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে আমি অজ্ঞান, কোনও বাধাই দিতে পারিনি। লাল লঙ্কাটা তক্ষুনি খেয়েছিলুম যে! তারপর নাকি আমি পাক্কা আড়াই দিন অজ্ঞান হয়ে থেকেছিলুম। গোড়ার দিকটা আমার মনে নেই। কিন্তু শেষের দিকে আমি আধো-আধো স্বপ্নে কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। অন্যদের কথা একটু একটু শুনতে পেলেও উত্তর দিতে পারিনি। বুঝলেন কাকাবাবু, এই লাল লঙ্কার রহস্যটা আমি আবিষ্কার করেছি। ওটা একটা বুনো বিষাক্ত ফল, ওটা খেলে মানুষ অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে। সেই সময় স্বপ্ন দেখে ভাবে, বুঝি অদৃশ্য হয়ে অনেক জায়গায় ঘুরছে। আমি ডেফিনিট, অরিজিৎদার এইরকম ব্যাপারটা হয়েছে।"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "সেই রাজকুমার লোক পাঠিয়ে তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? সেখান থেকে তুই ছাড়া পেলি কী করে!"

সন্তু হাসতে হাসতে বলল, "রাজকুমার খুব জব্দ হয়ে গেছে, কাকাবাবু। ওর লোক তো অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আড়াই দিনের মধ্যে আমি জাগিনি, মাঝখানে কী ঘটেছে তাও আমি জানি না। এদিকে রাজকুমার ভেবেছিল, ওর সাগরেদের হাতে মার খেয়ে আমি বুঝি মরতে বসেছি। ডাক্তার ডেকে এনে আমার চিকিৎসা করিয়েছে। ওষুধ খাইয়েছে। আমি চোখ

মেলবার পর সে বলেছিল, উঃ, বাঁচালে। তোমাকে দু-চারদিন আটকে রেখে তোমার কাকাবাবুর কাছ থেকে দু-চারটে জিনিস আদায় করব ভেবেছিলাম। শেষে দেখছি, মরা মেরে খুনের দায়ে পড়ার মতন অবস্থা। তুমি মরে গেলে আমাদের পুরো উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যেত। যাও বাছা, এবারের মতন ফিরে যাও ঘরে। কী খেলাই দেখালে। আড়াই দিন অজ্ঞান, অথচ শরীরে মাথায় কোনও চোট নেই। জানেন কাকাবাবু, শেষ পর্যন্ত রাজকুমার আমাকে খাতির করে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছে কাল দুপুরে। তারপর থেকেই আপনাকে টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করছি।"

সন্তুর কথা শেষ করার পর কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। অরিজিতের ওপর তাঁর রাগটাও কমে গেল। সে বেচারা ওই বিষফল খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই অদৃশ্য হওয়া ভেবেছে। এই জন্যই ঝোপেঝাড়ে যেসব অচেনা ফলটল ফলে থাকে, তা হুট করে খেতে নেই। নিজের ভুলের জন্য অরিজিৎ যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে।

কিন্তু কাস্তে-পাহাড়ের চূড়ার কাছে যে এসে হঠাৎ হানা দিল, সে কি কোনও ছদ্মবেশী মানুষ, না সত্যিই ইয়েতি।

কাকাবাবু ঠিক করলেন, আবার ঐ পাহাড়ের চূড়ায় একবার যেতে হবে।

যেমনি কথায় তেমনি কাজে
সেই ছেলেটি নয়তো বাজে

—

বেনী নস্করের মুন্ডু

মুর্শিদাবাদ জেলায় চিংড়িপোতা নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। সেই গ্রামে সাত-আটটির বেশি পাকাবাড়ী নেই, ইস্কুল নেই, পোস্ট অফিস নেই, শুধু প্রতি শনিবার একটা হাট বসে—অনেক দূর দূর থেকে মানুষ আসে। অধিকাংশই গরীব হিন্দু মুসলমান। কিছুই দেখার নেই সেই গ্রামের। শুধু সেখানে হাট হয়, তার মাঝখানে সাদা পাথরের তৈরি একটি মানুষের মূর্তি বসানো আছে।

মূর্তিটি বেশ পুরনো। একজন বুড়ো মতন বাঙালী ভদ্রলোকের মূর্তি, চোগা-চাপকান পরা, মুখখানা দুঃখী। মূর্তিটার পায়ের কাছে ইংরাজীতে কিছু লেখা ছিল—এখন এত অস্পষ্ট যে বোঝাই যায় না। হাটে যে-সমস্ত মানুষ আসে, তারা কেউ জানে না মূর্তিটা কার। পুরনো দিনের কথা আমরা বড্ড তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। গ্রামের যে সব ছেলেরা চায়ের দোকানে কিংবা নদীর ধারে আড্ডা মারে তাদের জিজ্ঞেস করলেও বিশেষ কিছু বলতে পারে না। দু-একজন ঠোঁট উলটে বলে, শুনেছি, লোকটা নাকি উকিল ছিল। গ্রামের খুব বুড়ো কয়েকজন জানে ঐ মূর্তিটার ইতিহাস।

আমি এক সময় মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরে ছিলাম। চিংড়িপোতা গ্রামের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ খুব বৃষ্টি আসায় আমি দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে একটা পাকা বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই বাড়ির মালিক আবদুল রব আমাকে খুবই খাতির যত্ন করেছিলেন, চমৎকার চমৎকার খাবাই খাইয়েছিলেন। সে রাত্তিরে আমাকে আর আসতে দেননি, তার বদলে অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন! সেইখানেই আমি বেণীমাধব লস্করের গল্প শুনি।

সে অনেকদিন আগের কথা। তখন আমরা জন্মাই নি, আমাদের বাবারাও জন্মাননি, আমাদের ঠাকুরদারা-দাদুরা তখন খুব ছেলেমানুষ। সে সময় আমাদের দেশে পুরোপুরি ইংরেজ রাজত্ব, আমরা তখন পরাধীন জাতি। রাস্তায় মাঠে সাহেবদের দেখলে এ দেশের মানুষ ভয়ে দূরে সরে যায়। আদালত-বিচারালয়ে বেশির ভাগ হাকিম আর বিচারকও ছিলেন সাহেব।

মুর্শিদাবাদের একটি মহকুমা শহরের আদালতে একজন সামান্য মোক্তার ছিলেন এই বেণীমাধব লস্কর। তখনকার দিনে ছোট উকিলকে বলা হতো মোক্তার। লোকে বলতো বাংলা জানা উকিল কেননা, আদালতে উকিল ম্যাজিস্ট্রেট সবাইকে তো তখন ইংরেজীতে কথা বলতে হতো—মোক্তাররা বাংলা ইংরেজী মিলিয়ে কোনো রকমে কাজ চালিয়ে নিত। মোক্তার কথাটা আরবী শব্দ ইংরেজীতে বলা হতো মুকটিয়ার।

যাই হোক, সেই আদালতে দু-তিনজন উকিল মোক্তার ছিল—তাদের মধ্যে বরদা রায় আর মোহন মোল্লার কাছেই বেশি মক্কেল আসতো। বুড়ো বেণীমাধব লস্করের ভাগ্য ছিল খুবই খারাপ—সে একটু তোতলা ছিল বলে, সে যখন উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যেত, তখন সবাই হেসে ফেলতো। তাই মক্কেলরা কেউ তার কাছে সহজে আসে না। আদালতের সামনে একটা বটতলায় সে হ্যাংলার মতন বসে থাকে, আর লোকজন দেখলেই বলে ওঠে, এই যে, এই যে! এখানে আসুন, ভা-ভা-লো মোক্তার।

নেহাত গরীব লোক ছাড়া বিশেষ কেউ আসে না তার কাছে। খুব কম পয়সা দিয়ে কাজ সারে। সারাদিনে বেণীমাধব লস্করের আট আনা-এক টাকার বেশী রোজগার হয় না।

বেণীমাধবের মুখে কেউ কখনো হাসি দেখেনি। সব সময় গোমড়া মুখ। সেটা তার রোজগার কম হয় বলেই নয়—তার খুব মাথা ধরার অসুখ। সব

সময় তার ভীষণ মাথা ধরে থাকে। তখন তো আর এত রকম মাথা ধরার ওষুধ বেরোয় নি যে টপ করে দুটো বড়ি খেয়ে নিলেই সেরে যাবে। নানারকম কবিরাজী হাকিমী ওষুধ খেয়েও তার কিছুই হয়নি। মাঝে মাঝে তার যন্ত্রণা এত বাড়ে যে সে দু হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে ছটফট করে।

কিন্তু এই বেণীমাধব লস্করই একদিন সবার কাছে দারুণ কৌতুহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা শুরু হলো এইভাবে। একদিন আদালতের টিফিনের সময় বেণীমাধব লস্কর বাইরের সেই বটতলায় বসে আছে মক্কেলের আশায়। মাথার ব্যাথাটা খুব বেড়েছে, দু হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে মাথা—এই সময় একজন জোয়ান চেহারার মুসলমান তার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, কর্তা, আমার একটা গরু চুরির মামলা আছে।

বেণীমাধব উৎসাহিত হয়ে উঠে বললো, কী মা-মা মামলা? বসো এখানে! ভা-ভালো ক'রে বলো!

লোকটি বলল, আমার দুধেলা গাই মুঙলিকে পাচ্ছি না দু দিন ধরে। তাহের আলি সেটাকে চুরি করেছে। নিজের গোয়ালে ঢুকিয়ে রেখেছে—গ্রামের আর পাঁচজন দেখেছে।

বেণীমাধব খাতা পেন্সিল বার করে কিছু লিখতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লোকটির চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তার মাথার মধ্যে যেন চিড়িক করে উঠলো। মুখখানা শুকিয়ে গেল। ভয় পেয়ে বললো, না বাপু, আমি তোমার মামলা নিতে পারব না।

লোকটি অবাক হয়ে বললো, কেন? আগে টাকা দিতে হবে? এই যে টাকা এনেছি!

লোকটি তার কোমর থেকে একটা রূপোর টাকা বার করলো।

বেণীমাধব সেটা ছুঁয়েও দেখলো না। জিজ্ঞেস করলো তোমার নাম কি রজ্জব আলি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার গাঁয়ের নাম কি পলাশধুবি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি বাবু তোমার মামলা নিতে পারবো না। তুমি বাড়ী যাও—

লোকটি রেগে উঠে বললো, কেন? বাড়ী যাব কেন? অন্য উকিল মোক্তার নেই? ভীমরতি ধরেছে বুড়োর! আমার গরু চুরি গেছে। আমি তার জন্য মামলা করতে পারবো না?

বেণীমাধব বললো, ভালো চাও তো বাড়ী যাও!

লোকটি কি বুঝলো কে জানে, আর কথা বাড়ালো না। পেছন ফিরে হন হন ক'রে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। আশেপাশের দু-একজন উকিল মোক্তার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। তারা সবাই অবাক! বেণীমাধবের এমনি মক্কেল জোটে না। আর চকচকে রূপোর টাকা দেখেও সে মক্কেল ফিরিয়ে দিল।

মোহন মোল্লা এসে জিজ্ঞেস করলো, কী হে বেণীবাবু, লোকটাকে একেবারে তাড়িয়ে দিলে। ব্যাপারটা কী?

বেণীমাধব বললো, লোকটা ভালো না।

আগে থেকে চিনতে লোকটাকে?

না!

তা হলে? গরু চুরির মামলা নিয়ে এসেছে—লোকটা ভালো কি খারাপ তা দেখার দরকার কি?

না হে মোল্লা সাহেব, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। লোকটাকে আগে থেকে চিনতাম না! কে যেন আমার মধ্যে বললো, ঐ লোকটা পলাশধুবির রজ্জব আলি। ওর মামলা নিও না।

বটে, বটে? এ যে তাজ্জব কথা।

শুধু তাই নয়, লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর একটা জিনিস দেখলাম! একখানা যেন ছবি। দেখলাম, এই রজ্জব আলি একখানা মস্ত বড় দা নিয়ে একটা সতেরো আঠারো বছর বয়সের ছোকরার ঘাড়ে কোপ মারছে। মারতে মারতে তাকে মেরে ফেললো। এই লোকটা খুনী!

মোহর মোল্লা হাসিতে ফেটে পড়ে বললো, আজকাল কি আফিং ধরেছো নাকি? না, গাঁজা-টাজা খাচ্ছো?

বেণীমাধব অসহায় ভাবে বললো, না না, বি-বি-বিশ্বাস করো, সত্যি সত্যি দেখলাম!

মোহন মোল্লা হাসতে হাসতে সবার কাছে এই গল্প করলো। সবাই ভাবলো, বুড়োর এবার মাথা খারাপ হয়েছে। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে?

গল্পটা ছড়িয়ে পড়লো অনেকের মধ্যে। এখন বেণীমাধবকে দেখলেই লোকে হাসে!

কিন্তু দু-তিন দিন বাদে সত্যি সত্যি পলাশধুবির রজ্জব আলি মানুষ খুনের দায়ে ধরা পড়লো পুলিশের হাতে। সে তার প্রতিবেশীর সতেরো আঠারো বছরের ছেলেকে মেরে কচুরিপানার তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। লোকে একটু অবাক হলো। কেউ কেউ ভাবলো, ঐ খুনের সময় নিশ্চয়ই বেণীমাধব কোনোক্রমে দেখে ফেলেছিল—সেই কথাটাই বলেছে অন্যভাবে।

এর দিন দশেক বাদে বেণীমাধব আর একটা আশ্চর্য কাজ করে ফেললো। সেদিন আদালতে একটা বড় মামলা চলছিল—অনেকেই সেটা দেখতে এসেছে। শশধর কুণ্ডু বলে একটা লোক একসঙ্গে তিনতিনজনকে খুন করেছে। আজ সেই শশধর কুণ্ডুর বিচারের শেষ দিন। নির্ঘাত তাঁর ফাঁসি হবে। অন্য অনেকের সঙ্গে বেণীমাধবও শুনছিল এক কোণে ব'সে। হাতে তার কোনো কাজ নেই। মাথার যন্ত্রণাটা তার আজকে আবার বেড়েছে! দু'হাত দিয়ে শক্ত ক'রে মাথা চেপে ধরে আছে।

হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো, শশধর কুণ্ডু নির্দোষ। শশধর কুণ্ডু নির্দোষ।

সবাই চমকে উঠলো। আদালত চলার সময় এই রকম ভাবে চেঁচিয়ে ওঠা খুব বে-আইনী। হাকিম হচ্ছেন চারলস উইলবারফোরাস ছোকরা বয়েস, ভীষণ রাগী। তিনি বললেন, সাইলেন্স!

বেণীমাধব তবু বললো, শশধর কুণ্ডু নির্দোষ। হুজুর ওকে ফাঁ-ফাঁ-ফাঁসি দেবেন না।

হাকিম বললেন, সাইলেন্স! এই মুকাটিয়ারকে নিকাল দেও!

বেণীমাধব উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ইওর অনার। আমাকে একদিন টাইম দিন। আমি জানি ও খুন করেনি। শশধর কুণ্ডু নট গিলটি ইওর অনার।

তারপর সে দৌড়ে আসামীর কাছে এসে বললো, তুমি আর একদিন সময় চাও। আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেবো। খুন করেছে পুলিন সরকার। কী ঠিক কিনা?

খুব হৈ-হৈ হয়েছিল সেদিন। বেণীমাধব বলেছিল, শশধর কুণ্ডুর বন্ধু পুলিন সরকারই খুনটুন করে বন্ধুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। পুলিন সরকারের বাড়ীর উঠোনে গাঁদাফুল গাছতলায় মাটি খুঁড়লে রক্তমাখা ছুরি আর গয়নাপত্তর পাওয়া যাবে। সব ঠিকঠাক মিলে গেল।

সেই মামলার খুব নাম ছড়িয়ে গেল বেণীমাধবের। সবার মুখে মুখে তার কথা। বরদা রায় আর মোহন মোল্লার খুব হিংসে হলো। লোকেরা এখন মামলার জন্য বেণীমাধব লস্করের কাছেই আসে।

কিন্তু বেণীমাধব সব মামলা নেয় না। আসামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে, এদিক ওদিক ঝাঁকায়। তারপর একসময় বলে, না বাপু, তোমার মামলা আমি নিতে পারবো না। তুমি অন্য রাস্তা দেখো! কিংবা কারুকে আবার বলে, তোমার মামলা আমি নেবো—কোন হাকিমের সাধ্য নেই, তোমাকে শাস্তি দেয়। সত্যি সত্যি তার কথা মিলে যায়। যে মামলা সে নেয় না—সেটা নির্ঘাত হার হয়। সে যে কটা মামলা নেয়, প্রত্যেকটা জিতিয়ে দেয়।

তার নাম রটে গেল হারা মামলার ধন্বন্তরি হিসাবে। সে নিজেও বাড়ীর সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল ঐ রকম।

হারা মামলার ধন্বন্তরি
পছন্দমতন হারা মামলা
লইয়া থাকি।
সাফল্যের গ্যারান্টি ১০০%
ফিস চার টাকা প্রতিদিন।
দরস্তুর নাই।

পর পর কয়েকটা মামলা প্রায় অলৌকিকভাবে জিতে যাবার ফলে বেণীমাধবের নামে সম্ভব অসম্ভব অনেকরকম গল্প রটতে লাগলো। বেণীমাধবের রোজগার অনেক বেড়ে গেলেও তার এই সৌভাগ্য যে বেশিদিন থাকবে না, তাও বোঝা যায়। তার মাথার মধ্যে সব সময় এখন অসম্ভব যন্ত্রণা। প্রতিটি মামলার পর সে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার আয়ু আর বেশিদিন নেই।

এর মধ্যেই স্থানীয় জমিদার নন্দ রায়ের ছেলে মধু একটা মামলায় জড়িয়ে পড়লো। প্রজাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের সময় হঠাৎ গুলি চলে—চারজন গরীব প্রজা মারা যায়। জমিদারের ছেলে মধু রায়ই গুলি চালিয়েছে। কিন্তু জমিদার বলছেন, গণ্ডগোলের সময় মধু তল্লাটে ছিল না—সে ছিল বহরমপুরে, তার অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খুব কড়া—তিনি মধু রায়ের নামে সমন জারি করেছেন।

এই সব মামলায় বড় বড় উকিল, ব্যারিস্টার লাগে, কিন্তু জমিদারমশাই বেণীমাধব লস্করকে ডাকবার জন্য পালকি পাঠিয়ে দিলেন। বেণীমাধব তখন খুবই অসুস্থ তবু জমিদারের ডাক এলে না গিয়ে উপায় নেই। পালকিতে যখন উঠতে যাচ্ছে, তখন একজন বৃদ্ধ চাষী হাউমাউ করে কেঁদে এসে বললো, বাবুগো, তুমি এ মামালা নিও না। দুষমনটা আমার ছেলেকে মেরেছে।

বেণীমাধব বললো, আমি ন্যায়ের পক্ষে। অন্যায়ের পক্ষে যাবার ক্ষমতা আমার নেই—তাহলে আমি মরে যাবো।

জমিদারমশাই বেণীমাধবকে খাতির করে বসালেন। রূপোর গড়গড়ার নল তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চিংড়িপোতা গাঁয়ের পঞ্চাশ বিঘে জমি আমি তোমার নামে লিখে দেবো—শেষ বয়সে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে পারবে।

বেণীমাধব জিজ্ঞেস করলো, হুজুর আমায় কী করতে হবে?

জমিদার বললেন, শোনো, কতকগুলো গুণ্ডাশ্রেণীর লোক আমার পাইক বরকন্দাজদের আক্রমণ করে—আমার পাইকরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায়। তা সে মামলা আমি পরে চালাবো। কিন্তু ব্যাটারা আমার ছেলে মধুর নাম এর সঙ্গে জড়িয়েছে। মধু তখন ছিল বহরমপুরে। সেখানকার চোদ্দজন লোক তার মধ্যে দু-জন মাস্টার দু-জন উকিল, একজন পুলিশের লোকও আছে—তারা হলপ ক'রে এর সাক্ষী দেবে। মধুর কোনই হাত নেই এর মধ্যে—তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই নেই।

বেণীমাধব বিনীতভাবে বললো, তাহলে তো হুজুর যে কোনো ভালো উকিলই এ মামলা জিতিয়ে দেবে—আমার মতন সামান্য মোক্তারকে ডেকেছেন কেন?

জমিদার বললেন, তোমার সুনাম আছে যে তুমি যে সে মামলা নাও না। তুমি এই মামলা নিলে কেউ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার সাহস পাবে না। অন্য উকিলরাও তোমাকে ভয় পাবে।

কিন্তু হুজুর, আসামীকে না দেখে আমি তো কিছুই করতে পারি না?

জমিদার রেগে উঠে বললেন, আসামী বলছো কাকে? আমার একমাত্র ছেলে, সে আসামী? তাকে দেখার তো দরকার নেই—আমি নিজেই তো সব বলছি তোমাকে।

তাকে না দেখলে আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবো না। সে ক্ষমতা আমার নেই।

তখন জমিদারের ছেলেকে ডেকে আনা হলো। তাকে দেখেই বেণীমাধব নিজের মাথাটা শক্ত ক'রে চেপে ধরলো, তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। বেণীমাধব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

ব্যস্ত হয়ে উঠে জমিদারের লোকজন তাড়াতাড়ি জল এনে তার মাথায় ঢাললো। একজন স্মেলিং সল্ট-এর শিশি ধরলো নাকের কাছে।

বেণীমাধব আস্তে আস্তে উঠে বসলো। তার দু-চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। হাত জোড় করে বললো, হুজুর আমাকে মাপ করুন। এ মামলা আমাকে নিতে বলবেন না।

জমিদার চোখ রাঙিয়ে বললেন না।

আমার ক্ষমতা নেই, আমি পারবো না।

তোমাকে আমি পাঁচশো টাকা দেবো। পঞ্চাশ বিঘে জমি দেবো।

আমি পারবো না।

এক হাজার টাকা।

হুজুর আ-আ আমাকে ছে-ছে-ছেড়ে দিন।

জমিদার তখন দারুণ রেগে গিয়ে বললেন, দ্যাখো মোক্তার! এ মামলা তোমাকে নিতেই হবে। না হলে তোমার ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবো, তোমাকে আমি শেষ করে দেবো।

জমিদার এমন ভয় দেখাতে লাগলেন যে রাজী না হয়ে উপায় রইলো না বেণীমাধবের। একতাড়া মোহর হাতে নিয়ে বিমর্ষ মুখে বাড়ী ফিরে এলো।

সেদিন রাত্তিরে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হলো। ঘুমের মধ্যে বিছানায় ছটফট করতে লাগলো বেণীমাধব। একবার এপাশ আবার গড়িয়ে ওপাশ। কেউ যেন তাকে ধরতে চেষ্টা করছে—তাতে বেণীমাধব পালাতে চাইছে। বেণীমাধব সেই অবস্থায় চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, ছেড়ে দে ছেড়ে দে! ভুল করেছি। আর করবো না।

ছেলে, মেয়ে, বউ বেণীমাধবের বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বেণীমাধব কোনরকমে উঠে বসে ছেলেকে বললো, শিগগির কাগজ কলম আন।

ছেলে কাগজ আর খাগের কলম এনে দিল। বেণীমাধব তৎক্ষণাৎ

জমিদারকে চিঠি লিখলো যে সে তাঁর ছেলের মামলা নিতে পারবে না। তার শরীর ভীষণ অসুস্থ। সে আর কোনো দিনই আদালতে যাবে না। চিঠি লিখে বেণীমাধব ছেলেকে বললো, ভোর হতে না হতেই এই চিঠি আর মোহরের থলি নিয়ে গিয়ে জমিদারকে দিয়ে আসবি। নইলে আমি আর প্রাণে বাঁচবো না।

সকালবেলা এক ছেলে চলে গেল জমিদার বাড়ীতে। আর এক ছেলে আদালতে গিয়ে খবর দিল, বেণীমাধব মোক্তারি পেশা ছেড়ে দিচ্ছে। আজ থেকে সে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে থাকবে, ধর্মকর্ম করবে।

এরপর আবার অন্য রকম একটা ঘটনা শুরু হলো। সেদিন সন্ধ্যেবেলা চারলস্ উইলবারফোস্ এর পেয়াদা এসে খবর দিল যে হাকিম সাহেব বেণীমাধবকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হাকিমের ডাক জমিদারের ডাকের চেয়েও বড়। বেণীমাধবের তখন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—সেই অবস্থাতেই পালকি ভাড়া করে যেতে হলো।

হাকিম সাহেবের বাংলোটি সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো। সবাই জানে তিনি খুব কড়া মেজাজের মানুষ, কিন্তু বেণীমাধবের সঙ্গে সহজভাবেই কথা বলতে লাগলেন। হাকিম বেশ বাংলা শিখেছেন।

তিনি বললেন, মুকটিয়ার, তুমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছো কেন?

বেণীমাধব বললেন, হুজুর, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না। তাই গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে শেষ জীবনটা কাটাতে চাই।

কী করে বুঝলে যে বাঁচবে না?

সে আমি বুঝে গেছি। আমি জ্বরে ভুগছি।

হাকিম সাহেব নিজে উঠে এসে বেণীমাধবের কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখলেন। তারপর দেরাজ থেকে কয়েকটা ওষুধ বার করে বললেন, এগুলো তিন ঘণ্টা পর পর খেয়ে নিও। জ্বর সেরে যাবে।

বেণীমাধব বললেন, জ্বর সেরে গেলেও আমি আর বাঁচবো না।

সাহেব এবার একটু হাসলেন। তারপর বললেন, মুকটিয়ার, একথা কি সত্যি যে তুমি মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারো যে সে দোষী না নির্দোষ?

বেণীমাধব চুপ ক'রে রইলো।

সাহেব আবার বললেন, আমার পেশকার আমাকে এ কথা বলেছে, আরও

অনেকেই এ কথা বলেছে। সমস্ত জেলার লোক এ কথা বিশ্বাস করে। ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত চিঠি লিখে আমার কাছে এ কথা জানতে চেয়েছে।

হুজুর, আমি সামান্য লোক।

আমি লক্ষ্য করছি, যে কটা মামলা তুমি নাও, ঠিক ঠিক জিতে যাও। এর রহস্য কী? সব খুলো বলো, তোমার কোনো ভয় নেই।

হুজুর সব বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। অনেক দিন ধরেই আমার মাথার মধ্যে খুব যন্ত্রণা হয়। ইদানিং কোনো মক্কেলের দিকে তাকালেই যন্ত্রণাটা বেড়ে যায়। এক সময় মাথার মধ্যে চিড়িক করে ওঠে—আর কে যেন ফিসফিস করে বলে দেয়, সেই লোকটি দোষী না নির্দোষ।

হাউ ইন্টারেস্টিং! এর ব্যাখ্যা কি?

আমি জানি না, তবে আমার মনে হয়, মৃত মানুষেরা আমার সঙ্গে কথা বলে। মানুষ যখন কারুকে খুন করে—তখন সেই মৃত লোকটির আত্মার একটি অংশ ঐ হত্যাকারীর মধ্যে ঢুকে যায়। আত্মার অংশটুকুই হত্যাকারীকে আজীবন শাস্তি দেয়। তার চোখের মধ্যে ঐ আত্মাটি আমাকে বলে দেয়, এ-ই আসামী। আর যখন কোন নির্দোষ লোককে দেখি, তখনও নিহত ব্যক্তিটি আমার চোখের সামনে এসে বলে দেয়—এ নয়, এ নয়! আসল লোককে দেখিয়ে দিচ্ছি! আপনার সেই শশধর কুণ্ডুর কেসটা মনে আছে? আপনি তাকে ফাঁসি দিতে যাচ্ছিলেন। যে তিনজন খুন হয়েছিল, তার মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েও ছিল। আমি হঠাৎ দেখলাম সেই বাচ্চা মেয়েটি আমার চোখের সামনে এসে বলছে এ নয়, এ নয়। তুমি বলে দাও না! আমি আসল লোককে দেখিয়ে দিচ্ছি। তখনই আমি সব দেখতে পেলাম, তখন চেঁচিয়ে না উঠে আমার উপায় ছিল না।

হাকিম বললেন, ফ্যানটাসটিক! এ কখনো হতে পারে?

বেণীমাধব বললো, বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমার এরকম হয়।

আচ্ছা মুকটিয়ার একটা কথা বলো তো। তুমি যখন অপরাধীকে—এ কথাটা বুঝতে পারো—তাহলে তো তুমি ইচ্ছে করলে সেই অপরাধীকে বাঁচিয়ে দিতে পারো; তুমি তখন তার বিরুদ্ধে প্রমাণ টমান সবই জানো—তাহলে সেগুলি সরিয়ে দিলেই তো আর কেউ তাকে ধরতে পারবে না।

হুজুর, মাথার ওপরে ভগবান আছেন, তিনিই একমাত্র জানেন, আমি জেনেশুনে কোনদিন অন্যায়ের পক্ষে নিইনি। তা যদি আমি করতাম—তাহলে যে সব মরা মানুষ আমার সঙ্গে এসে কথা বলে—তারা কি আমায় ছেড়ে দেবে, কালকেই তো—

কালকে কী হয়েছে?

বেণীমাধব একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বললো, হুজুর, আপনি হাকিম। আপনার সামনে নামধাম বলা উচিত হবে না, কাল এক জায়গায় যেতে হয়েছিল আমাকে। একজনের মামলা নিতে হবে। যেই আমি তার দিকে তাকিয়েছি, দেখলাম কি চারজন গরীব চাষীর মূর্তি সেই লোকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে—সবাই তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, এ-ই খুনী। আমি আর সে মামলা নিতে রাজী হলাম না। কিন্তু সেই পক্ষ আমাকে ভয় দেখালো, জোর করে আমাকে সেই মামলা নিতে রাজী করালো। মাঝ রাত্রে সেই চারজন মরা লোক ঘিরে ধরলো আমাকে। ঘৃণার সঙ্গে বলতো লাগলো—তুমি আমাদের খুনীকে বাঁচাবে? তাকে বাঁচাবে? সেই জন্যই তো আমি মোক্তারি করাই আজ থেকে ছেড়ে দেবো, ঠিক করলাম।

হাকিম সাহেব অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বললেন, তুমি বললে না, যে সব সময় তোমার মাথায় ব্যাথা করে? এর জন্য চিকিৎসা করাও নি?

অনেক করিয়েছি, কিছুতেই সারে না।

হাকিম উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, মুকটিয়ার, তোমার মুণ্ডুটা আমার চাই।

বেণীমাধব চমকে উঠে বললো, কী বললেন?

তোমার মুণ্ডুটা আমার চাই!

বেণীমাধব হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। হাকিম বললেন, তুমি রোনালড এর নাম শুনেছ? মস্তবড় ডাক্তার, কলকাতায় ব'সে ব'সে সে মশার পেট থেকে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বার করছে। সে আমার বন্ধু। তাকে আমি খবর পাঠাচ্ছি।

আজ্ঞে, তিনি এসে কী করবেন?

শোনো, আমরা খ্রীষ্টান। আমরা মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার ঘুরে বেড়ানো কিংবা মরা মানুষ এসে কথা বলে যাওয়ার বিশ্বাস করি না। তোমার কেসটা

খুব সম্ভবত প্যাথোলজিকাল—তোমার মাথার গড়নের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে—যে জন্য তুমি এসব কল্পনা করো। সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। তোমার মৃত্যুর পর তোমার মাথাটা কেটে ছিঁড়ে দেখতে হবে।

হু-হু-হুজুর, এ কী বলছেন?

ভয় পাচ্ছো? তুমি মরে গেলে তো আর তোমার ব্যাথা করবে না। ভয় কী?

হুজুর, আমরা হিন্দু। মৃত্যুর পর আমাদের শব দাহ না করলে আত্মা—

ঐ তো, দেহটা পুড়িয়েই তো নষ্ট করবে! তার চেয়ে বিজ্ঞানের উপকারের জন্য দিয়ে যাও। এর থেকে বিজ্ঞানের কোনো রহস্য বেরিয়ে যেতে পারে। তোমাকে দিতেই হবে।

বেণীমাধব সেদিন কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরলো। এ কী সাংঘাতিক কথা, সাহেব তার মুণ্ডু কেটে নিতে চায়! এই সাহেব যা গোঁয়ার, জ্যান্ত অবস্থাতেই কেটে নিয়ে যাবে কিনা—কে জানে।

সেদিন থেকে সাহেবের পেয়াদারা তার বাড়ী পাহারা দিতে লাগলো, দু-দিন বাদেই বেণীমাধব একেবারে শয্যাশায়ী, মরো মরো অবস্থা। রাত্রির দিকে বেণীমাধবের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে গেল, খবর পেয়ে হাকিম সাহেবও দলবল নিয়ে হাজির হলেন। পাছে ঐ মূল্যবান মাথাটা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়।

এদিকে এ খবরও রটে গেছে যে সাহেব বেণীমাধবের দেহ পোড়াতে দেবে না। ম্লেচ্ছ ডাক্তাররা শরীরটা নিয়ে কাটাছেঁড়া করবে। স্থানীয় হিন্দুরা খুব রেগে গেল। এটা তাদের ধর্মের অপমান। লাঠিসোটা নিয়ে তারা এগিয়ে এলো—কিছুতেই দেহ নিতে দেবে না। স্থানীয় মুসলমানরাও বললো, এটা ভারী অন্যায়। ভারী অন্যায়। সাহেবরা ধর্মে হাত দিচ্ছে?

খুব গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও এসে হাজির হলেন। সঙ্গে একজন ডাক্তার নিয়ে। সবাই মিলে ভিড় ক'রে রইল বেণীমাধবের ঘরে!

বেণীমাধব চোখ বুজে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। হাত দুখানা বুকের ওপর জোর করা। বিড় বিড় করে কী যেন বলছে, শোনা যায় না। একেবারে বুকের কাছে কান নিয়ে বোঝা যায় সে বলছে, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। আমি জমিদারের ছেলের মামলা নিইনি। আমি কক্ষনো অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিনি। ভগবান জানেন, কখনো করিনি!

ডাক্তার নাড়ী ধরে ব'সে ছিল। একসময় হতাশভাবে ছেড়ে দিয়ে বললো, সব শেষ।

হাকিম সাহেব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, সব শেষ? ভালো ক'রে দ্যাখো।

ডাক্তার আবার পরীক্ষা ক'রে বললেন, দেহে প্রাণ নেই।

হাকিম তখন বেণীমাধবের আত্মীয়স্বজনকে বললেন, আপনাদের ধার্মিক কাজ সেরে নিন। আমি এই ডেড বডি নিয়ে যাবো। বরফে ঢেকে রাখতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, চারলস, কাজটা কি ঠিক হবে?

বেণীমাধবের ছেলে বললেন, আমরা দেহ নিয়ে যেতে দেবো না।

হাকিম তেজের সঙ্গে বললেন, আমি নিয়ে যাবোই। মুকটিয়ারের সঙ্গে আমার এ সম্পর্কে কথা হয়েছিল। ওর আপত্তি ছিল না।

ঘরের মধ্যে একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। কারোর কথাই শোনা যায় না! মেয়েরা কান্নাকাটি করছে আর পুরুষরা চ্যাঁচাচ্ছে।

এই সময় বেণীমাধবের আবার চোখ খুলে গেল। ঘরের সবাই আঁতকে উঠলো। ডাক্তার বললো, বাই জোভ! বাই জোভ!

বেণীমাধব তীব্র চোখে তাকালো শুধু হাকিম সাহেবের দিকে। অন্য রকম গলার আওয়াজ বেশ জোরে বলে উঠলো, সাহেব, তুমি বাড়ী চলে যাও।

ঘরের মধ্যে অনেকে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, একজন মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়লো, কিন্তু হাকিম সাহেব একটুও ভয় পেলো না। কাছে এগিয়ে এসে বললো, মুকটিয়ার, তুমি বেঁচে আছো?

বেণীমাধব বললো, সাহেব, তুমি এক্ষুনি বাড়ী চলে যাও। একটুও দেরি করো না। তোমার বাড়ীর দরোয়ান মারা গেছে। তোমার ছেলে আর বউ-এর খুব বিপদ—শিগগির যাও!

হাকিম সাহেব আর একটুও দেরী করলেন না। দৌড়ে বাইরে চলে এলেন। তার ঘোড়া দাঁড় করানোই ছিল, সেই গভীর রাত্রে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন বাড়ীর দিকে—অন্যরাও গেল পেছন পেছন। একটু পরেই পর পর বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। ততক্ষণে বেণীমাধব আবার মরে কাঠ। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা।

সেই রাত্তিরে হাকিম সাহেবের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল। ডাকাতরা বাড়ীর দরোয়ানকে মেরে ফেলে বাংলোর ভেতরে ঢুকে পড়ে মেমসাহেবকে আক্রমণ করতে যায়। মেমসাহেব তার ছেলেকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছিল। ডাকাতরা দুমদাম শব্দে দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে—সেই সময়ে হাকিম সাহেব এসে পড়লেন। আর একটু দেরী হলে বউ আর বাচ্চাকে বাঁচানো যেত না। একজন ডাকাত মরলো, দু-জন ধরা পড়ে গেল।

হাকিম সাহেব বেণীমাধব লস্করের দেহ কাটা ছেঁড়া করে দেখতে চাননি। তার বদলে নিজের খরচে বেণীমাধবের একটা মূর্তি তৈরি করিয়ে তার গ্রামে স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তলায় লিখে দিয়েছিলেন শেক্সপীয়ারের একটা লাইন স্বর্গে, মর্তে এমন অনেক ব্যাপার আছে, হোরেশিও, যা তুমি কল্পনাও করতে পারো না।

"নাক্ তেরে কেটে তাক্" বোল্ মুখে বলা সহজ, হাতে বাজান কঠিন। সেই রকম ধর্মকথা বলা সোজা, কাজে করা কঠিন।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ

কালো চশমা পরা লোকটা দাঁড়িয়েছিলেন হাজরা রোডের মোড়ে। অনেকেই রোদ্দুরের সময় নানারকম রঙের সান গ্লাস পরে, তাই দীপু প্রথমেই কিছু বুঝতে পারেনি। তারপর লোকটির হাতে একটা সাদা রঙের লম্বা লাঠি দেখে দীপু বুঝতে পারলো যে লোকটি অন্ধ।

দীপু বাবার কাছে শুনেছিল যে সারা পৃথিবীতেই অন্ধ লোকেরা রাস্তায় বেরুবার সময় হাতে ঐ রকম ঠিক সাদা রঙের একটা লাঠি রাখে। তাতে অন্য লোকদের চিনবার সুবিধে হয়। অনেক সময় অন্য লোকেরা রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে একজন অন্ধ লোককেই ধাক্কা দিয়ে বলে ওঠে, চোখ নেই নাকি? দেখেশুনে হাঁটতে পারো না?

বিকেল পাঁচটা, এই সময় হাজরা রোডে দারুণ ভিড়। অনবরত গাড়ি যাচ্ছে আসছে। দীপুর মনে হলো অন্ধ লোকটি রাস্তা পার হতে পারছেন না বলেই দাঁড়িয়ে আছেন।

সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি রাস্তার ওপারে যাবেন? আমি আপনার হাত ধরে নিয়ে যেতে পারি।

লোকটি খুব বুড়োও নয় যুবকও নয়। মুখে দাড়ি আছে। সেই দাড়ি আর মাথার চুল সামান্য কাঁচা পাকা। লোকটি বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিলেন, দীপুর কথা শুনে চমকে উঠলেন।

দীপু লোকটির হাত ধরে বললো, চলুন আমি আপনাকে ওপারে পৌঁছে দিচ্ছি।

লোকটিকে নিয়ে দীপু রাস্তায় নেমে পড়লো। একটা হাত উঁচু করে রইলো যাতে গাড়িগুলি তাদের দেখে থেমে যায়। সত্যিই অনেক গাড়ি হর্ণ দিতে দিতে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষতে লাগলো।

রাস্তার ওপারে এসে দীপু বললো, এবার আপনি কোন দিকে যাবেন? ডান দিকে না বাঁ দিকে? আমি কি আর একটু এগিয়ে দেবো আপনাকে?

লোকটি এবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন দিকে থাকো ভাই? রাস্তার এপারে না ওপারে?

দীপু বললো, রাস্তার ওপারে। আমি বাড়ীর জন্য একটা পাউরুটি কিনতে এসেছিলাম।

লোকটি বললেন, তাহলে তুমি এপারে এলে—কেন ভাই?

দীপু বললো, বাঃ এইটুকু এলে কী হয়েছে ঃ আপনি রাস্তা পার হতে পারছিলেন না, সেইজন্য!

লোকটি বললেন, তাহলে এসেছই যখন, তখন তোমাকে আর একটু আসতে হবে। তুমি আমার বাড়ীতে পৌঁছে দাও।

দীপু একটু কিন্তু কিন্তু করতে লাগলো। মা তাকে বলেছিলেন মোড়ের দোকান থেকে পাউরুটি কিনে আনতে। বেশিক্ষণ তো লাগবার কথা নয়। দীপুর ফিরতে দেরী হলে মা চিন্তা করবেন।

কিন্তু একজন লোক যদি বলে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে, তাহলে না বলা উচিত নয়। তাছাড়া দীপুর এখন তের বছর বয়েস হয়ে গেছে, সে তো আর রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না। সে এদিককার সব রাস্তাই চেনে।

অন্ধ লোকটি বললেন, এই যে, কাছেই হাজরা পার্ক, এটা তুমি কোনাকুনি পার হয়ে চলো, তারপর দেখবে একটা গলি, সেই গলি দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকে একটা হলদে রঙের তিনতলা বাড়ী সেই বাড়ীতে আমি থাকি। তুমি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

দীপু বললো, চলুন।

অন্ধ লোকটির হাত ধরে দীপু পার্কটা পার হতে লাগলো। তারপর সেই গলির মধ্যে খানিকটা গিয়ে হলদে তিনতলা বাড়ীটা পেয়ে গেল সহজেই।

সে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দীপু বললো, এবার আমি যাই।

লোকটি বললেন, না, না এখন যাবে কি। আমাকে একদম ঘরে পৌঁছে দাও। ভেতরে ঢুকে দেখবে একটা উঠোন, তার ডান পাশে সিঁড়ি। আমরা কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠবো না। তুমি আমাকে সিঁড়ির পেছন দিকটা নিয়ে চলো।

বাড়ীটা তিনতলা হলেও মনে হয় ফাঁকা। কোন লোকজনের সাড়া শব্দ নেই। এতবড় বাড়ীতে কি আর কোন লোক থাকে না? দীপুর একটু অবাক লাগলো।

সিঁড়ির পেছনে বেশ খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় বাড়ীর যতসব ভাঙা জিনিসপত্র থাকে।

অন্ধ লোকটি এবার দীপুর হাত ছেড়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়লেন। তারপর জামার পকেট থেকে বার করলেন একটা চাবি। মাটির মধ্যে একটা ছোট্ট গর্ততে লোকটি সেই চাবি ঢুকিয়ে দিয়ে ঘোরাতেই পট করে শব্দ হলো।

দীপু আরও অবাক হয়ে গেল। কোনো তালা নেই, শুধু মাটির গর্ততে চাবি ঢোকাবার ব্যাপারটা বুঝলো না। তা ছাড়া লোকটি অন্ধ হলেও চাবিটা একবারই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন কী করে?

মিষ্টির দোকানের আলমারিগুলোর পাল্লা যেমন ঠেললেই একদিকে সরে যায়, লোকটি এবার মাটিতে চাপ দিতেই সেরকম একটা পাল্লা একদিকে সরে গেল। দীপু দেখলো নীচের দিকে একটা অন্ধকার গর্ত।

'লোকটি নিজেই এবার দীপুর হাত ধরে বললেন, এসো।'

দীপু জিজ্ঞেস করলো, আমি কোথায় যাবো?

লোকটি বললেন, এসোই না। তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি?

ভয় পাওয়ার কথা শুনলেই দীপুর সাহস বেড়ে যায়।

একজন অন্ধ লোকের সঙ্গে অন্ধকারে নামতে সে ভয় পাবে কেন? ভেতরে পা দিয়ে দেখলো, একটা কাঠের সিঁড়ি আছে। তবে সিঁড়িটা বেশ সরু। দুজনে পাশাপাশি নামা যায় না। অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না।

লোকটি বললে, ঠিক গুণে গুণে ছত্রিশটা সিঁড়ির ধাপ নেমেই থামবে। তখন সামনে একটা দরজা দেখতে পাবে।

লোকটি আগে নিজে নিজেই বেশ টপাটপ নেমে যেতে লাগলেন; নামতে নামতে দীপুকে বললেন, দেখো, যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে যেও না।

দীপু ভাবলো, বাঃ, বেশ মজা তো। অন্ধ লোকটি তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছেন, আর সে হোঁচট খাবে। অবশ্য অন্ধ লোকটির নিশ্চয়ই বারবার ওঠানামা করতে বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে।

ছত্রিশটা ধাপ নামার পর দীপু থামলো। একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না।

অন্ধ লোকটি সামনের দেয়ালে হাত গিয়ে সুইচ টিপতেই ঝলমলে আলো জ্বলে উঠলো।

দীপু দেখলো, পাশাপাশি দুখানা তালা বন্ধ ঘর আর একটা বারান্দা। কলকাতার কোনো বাড়ীতে যে এরকম মাটির নীচে ঘর থাকে, দীপু জানতো না। তার ধারণা ছিল যে আগেকার সব দুর্গতেই শুধু মাটির নীচে সুরঙ্গ থাকতো।

লোকটি আবার পকেট থেকে একটা চাবি বার করে একটা ঘরের তালা খুলে ফেললেন। এবারের তালায় চাবি পরাতে তাঁর একটুও দেরি হলো না।

ঘরটার মধ্যে একটা খাটে বিছানা পাতা, একটা চেয়ার টেবিল, আর একটা খরগোস রয়েছে।

ঘরে ঢুকে লোকটি একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বালাতেই তার থেকে খুব গাঢ় নীল রঙের আলো জ্বলে উঠলো।

লোকটি দীপুকে বললেন, বসো।

দীপু বললো, আপনি এখানে থাকেন? এই মাটির নীচে?

—হ্যাঁ, ওপরের আলো আমার ঠিক সহ্য হয় না।

—আচ্ছা আপনি তো পৌঁছে গেছেন, এবার আমি বাড়ী যাই।

—না, না, এক্ষুনি বাড়ী যাবে কি? তোমার নামটা এখনো জানা হলো না।

দীপু নিজের নাম জানালো। লোকটি বললেন, তাঁর নাম পিনাকপাণি। এরকম অদ্ভুত নাম দীপু আগে কখনো শোনেনি।

হাতের সাদা লাঠিটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে লোকটি চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেললেন।

লোকটির দুচোখে দুটি ময়দার ডেলা লাগানো, অথবা কাচ জোড়ার জন্যে যে পুটিং লাগায় তাও হতে পারে।

হাত দিয়ে সেই ডেলা দুটো টেনে খুলে ফেলে লোকটি দীপুর দিকে চেয়ে হাসলেন।

লোকটি অন্ধ নয়।

দীপু একটু শিউরে উঠলো। অন্ধ নয়, তবু ইচ্ছে করে অন্ধ সেজে থাকে! তাহলে লোকটা কে? ডিটেকটিভরা অনেক সময় ছদ্মবেশ নেয়। লোকটা তাই? কিংবা চোর বা গুণ্ডাও হতে পারে।

লোকটি বললেন, ভাবছো তো চোর, গুণ্ডা কিংবা ডিটেকটিভ কিনা? আমি ওসব কিছুই নই। আমি সাধারণতঃ এ জায়গা ছেড়ে বাইরে যাই না। তবু মাঝে মাঝে দু-একবার যেতেই হয়। খোলা হাওয়া ও নিঃশ্বাস নেওয়াও তো দরকার। তখন অন্ধ সেজে না থাকলে আমার খুব অসুবিধে হয়।

দীপু ভাবলো, এ আবার কী কথা? চোখ থাকতে কেউ কি অন্ধ সেজে থাকে? অন্ধ হলেই তো বেশী অসুবিধে।

লোকটি বললেন, এই নীল আলো ছাড়া অন্য কোনো আলো আমার সহ্য হয় না। তাছাড়া আরও গণ্ডগোল হয়। আমার চোখ নিয়ে মহা মুস্কিল। তোমার হাতে কী? খরগোস?

দীপুর হাতে একটা হাফ পাউণ্ড পাউরুটি ছিল। এমনি সেটা জ্যান্ত হয়ে একটা খরগোস হয়ে গেল।

দীপু চমকে সেটা ছেড়ে দিতেই খরগোসটা মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগলো।

দীপু খুব চমকে গেলেও সামলে নিল তাড়াতাড়ি; এ ব্যাপারটায় সে ভয় পায়নি। লোকটি তাহলে ম্যাজিশিয়ান; ম্যাজিশিয়ানরা ও রকম পারে। জাদুকর ম্যানড্রেকের ছবিতে দীপু এ রকম দেখেছে।

লোকটি গম্ভীর গলায় বললেন, আমি ম্যানড্রেলের মতন ম্যাজিক দেখাই না। আমি পিনাকপাণি।

দীপু এবার সত্যিই একটু ভয় পেয়ে গেল! লোকটি মনের কথা বুঝতে পারে। দীপু মনে মনে যা ভাবছে। লোকটি তক্ষুনি সেটা বলে দিচ্ছে।

পিনাকপাণি বললেন, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমার চোখে একটা অসুখ হয়। চোখে ভীষণ ব্যাথা করতো। অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। ওষুধ লাগিয়েছি, কোনো ফল হয় নি। তখন আমার নাম ছিল বিজনকুমার বসু।

—তখন আপনার অন্য নাম ছিল?

—হ্যাঁ। তখন আমি জামসেদপুরে থাকতাম, ষ্টিল প্ল্যান্টে কাজ করতাম। চোখে কোনো সময় আগুনের ঝাপটা লেগেছিল কিংবা অন্য কিছু হয়েছিল জানি না। সেই থেকে চোখে খুব ব্যাথা। তারপর একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে চোখ মেলবার পর দেখলাম, আমার একটুও ব্যাথা নেই। আর আমার মাথার মধ্যে কে বললো, তুমি বিজনকুমার বসু নও, তুমি পিনকাপাণি।

—কে বললো একথা।

—তা তো জানি না; আমার মাথার মধ্যে কেউ যেন ফিসফিস করে উঠলো। আমি তো প্রথমে খুব অবাক। কিন্তু মাথার মধ্যে অনবরত ঐ কথাটা শুনতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কে পিনাকপাণি। তার কোনো উত্তর পেলাম না তখন।

দীপু মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার হাতের পাউরুটিটা তখনও খরগোস হয়ে লাফাচ্ছে। দীপুর কাছে আর পয়সা নেই। মা তাকে পাঁউরুটি কিনে আনতে বলেছিলেন। পাউরুটির বদলে খরগোস নিয়ে গেলে কি মা খুশী হবেন।

পিনাকপাণি অমনি দীপুর মনের কথা বুঝে নিয়ে বললেন, কোনো চিন্তা নেই, তুমি পাঁউরুটি নিয়েই বাড়ী ফিরবে!

দীপু একটু কেঁপে উঠলো। কেউ এমনভাবে মনের কথা বুঝে ফেললে দারুণ অস্বস্তি হয়।

পিনাকপাণি আবার বললেন, তোমাকে এসব কথা বলছি কেন জানো? আমি তো এতদিন রাস্তা দিয়ে ঘুরি অন্ধ সেজে, কিন্তু এর আগে, কেউ একজনও আমায় রাস্তা পার করে দিতে চায় নি। কলকাতা শহরের মানুষের মনে মায়া নেই। তুমিই প্রথম দিলে। অবশ্য আমার কোনো দরকার হয় না। আমি কিছু না দেখেও হাঁটতে পারি। একদিন একটা গাড়ি আমায় চাপা দিয়েছিল, কিন্তু আমি মরিনি।

দীপু বললো, আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। নইলে মা ভীষণ চিন্তা করবেন।

পিনাকপাণি বললেন, তুমি ভাবছো, আমি ভূত তাই না? গাড়ি চাপা পড়ার পর মরে ভূত হয়ে গেছি? সত্যি আমি মরিনি। তুমি আমার হাতে চিমটি কেটে দেখো।

পিনাকপাণি নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন দীপুর কোলের কাছে। সত্যিই মানুষের মতন হাত। তাছাড়া দীপু তো ওর হাত ধরেই রাস্তা দিয়ে এনেছে।

পিনাকপাণি বললেন, আমি ইচ্ছে না করলে তো তুমি এঘর থেকে যেতে পারবে না। সেই জন্য চুপটি করে বসে আমার কথা শোনো। হ্যাঁ, সেই জামসেদপুরের কথা বলছিলাম। সেখানে আমার বউ ছেলেমেয়ে সব ছিল। আমার চোখ ভাল হয়ে যাবার পর আনন্দে সেই কথাটা সবাইকে বলতে গেলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরুলো না। শুধু গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগলো। তখন সবাই ভাবলো, আমি পাগল হয়ে গেছি!

দীপু আবার চোখ গোলগোল করতেই পিনাকপাণি বললেন, আমি কিন্তু সত্যিই পাগল হইনি। সে ব্যাপারে তোমার ভয়ের কিছু নেই। তবে একথা ঠিক, আমি এক জীবনে দু'জন মানুষ হয়ে গেছি। আগে ছিলাম বিজনকুমার বসু, এখন পিনাকপাণি। জামসেদপুরে আমার বাড়ীর লোক আমাকে জোর করে পাগলা গারদে দেবার চেষ্টা করতেই আমি বাড়ী থেকে পালালাম। স্টেশনে এসে সামনে যে ট্রেনটা দেখলাম, উঠে পড়লাম সেটাতেই। তখন আমার মাথার মধ্যে ফিসফিস করে কে যেন বললো, কলকাতায় চলে যাও, হাজরা পার্কের পেছন দিকে একটা গলি, যেখানে হলদে রঙের তিনতলা বাড়ী—সেই বাড়ী তোমার।

দীপু বললো, এই পুরো বাড়ীটা আপনার? তাহলে আপনি ওপরে না থেকে এই মাটির নীচে থাকেন কেন?

—বললাম না, ওপরের আলো আমার সহ্য হয় না। আমার চোখটা বদলে গেছে বলেই মানুষ হিসাবে আমি বদলে গেছি। কী রকম আমার চোখের অবস্থা হয়েছে শুনবে? হাওড়া স্টেশন থেকে সেদিন যখন আমি আসছি, বড়বাজারের কাছে একটা পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। কী জানি কেন সেই পুলিশটার ওপর রাগ হলো। সে বোধহয় উল্টো পাল্টা হাত দেখিয়েছিল। আমি মনে মনে বললাম, এই পুলিশটা একটি গাধা। আর সঙ্গে সঙ্গে কী হলো জানো? পুলিশটা তক্ষুনি একটা গাধা হয়ে গেলো। সত্যি সত্যি। আর কেউ বুঝতে পারলো না। সবাই ভাবলো পুলিশটা কোথায় চলেগেছে, আর সেখানে একটা গাধা ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমি তো সেদিকেই তাকিয়েছিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ চেপে ধরলাম। ওঃ সেদিন কী ভয় পেয়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে পিনাকপাণি নিজের চোখেও হাত চাপা দিয়ে ফেললেন, তারপর একটু বাদে হাত দুটো আবার সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

জল মুছে নিয়ে তিনি বললেন, এটা একটা অভিশাপ। বুঝলে দীপু, একটা দারুণ অভিশাপ। রাস্তাঘাটে এই জন্যই আমি অন্ধ সেজে যাই। কোনো মানুষের উপর যদি আমার হঠাৎ রাগ হয়, তবে তার দিকে তাকিয়ে গরু, গাধা, ছাগল ভাবলেই সেইরকম হয়ে যায়।

খরগোসটা দীপুর আঙুলে কুটুস করে কামড়ে দিল। দীপুর পায়ে চটি পরা, আঙুলগুলো বেরিয়ে আছে। আর সেই আঙুলগুলোকে বোধহয় কোনো খাবার ভেবে খরগোসটা কামড়াচ্ছে।

দীপু খরগোসটাকে একটা লাথি কষালো।

সত্যিই খুব আশ্চর্য ব্যাপার, যেটা একটু আগে ছিল একটা পাঁউরুটি সেটা এখন খরগোস হয়ে গিয়ে রীতিমত কামড়াচ্ছে। তার মানে এটা ম্যাজিকের খরগোস নয়।

পিনাকপাণি খরগোসটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আর তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই একটা জায়গায় আমি হেরে যাই। আমি একটা পাঁউরুটিকে খরগোস বানাতে পারি। কিন্তু সেই খরগোসটাকে আর পাঁউরুটি অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।

বাইরের খরগোসটাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে খাঁচার খরগোসগুলো লাফালাফি করছে।

পিনাকপাণি বললেন, এর একটাও আসল খরগোস নয়। আগে অন্য জিনিস ছিল। এগুলোকে রেখে দিয়েছি কেন জানো তো। রোজ চেষ্টা করে দেখি, ওদের আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় কিনা। কিন্তু আমি এক জিনিসকে দু'চার বার পাল্টাতে পারি না। এসো তোমাকে পাশের ঘরটা দেখাই।

পিনাকপাণি বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের তালাটা খুললেন। সেই ঘরের মধ্যে একটা বোঁটকা গন্ধ। সেখানেও একটা নীল আলো জ্বালবার পর দীপু দেখলো, সেই ঘরেও কয়েকটা খাঁচা রয়েছে। পাঁচটা খাঁচা, তার মধ্যে দুটোতে দুটো ছাগল, একটাতে একটা বাঁদর, একটাতে একটা বেড়াল আর একটাতে হরিণের বাচ্চা।

পিনাকপাণি বললেন, ওরা আসলে সবাই মানুষ।

দীপুর বুকের মধ্যে দপ্ করে উঠলো। বলছে কী লোকটা। এরা সবাই মানুষ? নাকি লোকটা আগাগোড়াই গাঁজা দিচ্ছে।

কিন্তু দীপুর হাতের পাউরুটিটাকে খরগোস হয়ে যেতে তো সে নিজের চোখেই দেখেছে।

পিনাকপাণি বললেন, এরা আমার জন্যই বদলে গেছে। ঐ হরিণছানাটা আর বেড়ালটা আসলে দুটো মেয়ে। আর ছাগল দুটো আর বাঁদরটা তিনটে ছেলে। ওদের এখানে রেখে দিয়েছি কেন? বাইরের কেউ ওদের মেরে ফেলতে পারে। আমি ওদের এখানে খুব যত্নে রেখেছি। আর রোজ চেষ্টা করি। ওদের যদি আবার মানুষ করে দিতে পারি। এখনো পারছি না।

দীপু ভাবলো, ওরে বাপরে। লোকটা যদি তাকেও ছাগল কিংবা বাঁদর করে দেয়? তাহলে আর সে কোনদিন মা বাবার কাছে ফিরতে পারবে না।

পিনাকপাণি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, না, তোমাকে অন্য কিছু করে দেবো কেন? তোমার ওপর কি আমি রাগ করতে পারি? তুমি যে অন্ধ ভেবে আমায় রাস্তায় পার করে দিয়েছো। আর কেউ কখনো দেয়নি।

দীপু বললো, আমি তা হলে এবার বাড়ী যাই?

পিনাকপাণি কিছু উত্তর দেবার আগেই ওপর দিকে দুম করে শব্দ হলো। কেউ যেন ওপরের দরজায় ধাক্কা মারছে।

পিনাকপাণি তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। একটু বাদেই ফিরে এলেন হাতে দুটো টিফিন কেরিয়ার নিয়ে।

তিনি বললেন, আমার আর এই ছেলেমেয়েদের খাবার। একজন চাকর রেখেছি। সে দু'বেলা খাবার দিয়ে যায়। তুমি কিছু খাবে।

দীপু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, না, না, না।

—বাড়ী ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? একদিন না হয় একটু দেরী করেই ফিরলে। তোমাকে আনার কারণ আর একটু উপকার করতে হবে।

—আমি আপনার কি উপকার করবো?

—বলছি। তোমার সাহস আছে?

—কী জানি, জানি না।

খাঁচার বাঁদরটা কিচু-মিচু কিচু-মিচু করে ডেকে উঠলো।

পিনাকপাণি বললেন, এই ছেলেটার আগে নাম ছিল সুবোধ। ওর স্বভাব কিন্তু মোটেই সুবোধ ছিল না। হাজরা পার্কে গুণ্ডামি করে বেড়াতো আর খুব জ্বালাতন করতো লোকজনদের। একদিন কোনো কারণ নেই, আমি হাজরা পার্কের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, ঐ ছেলেটা দৌড়ে এসে আমার পায়ে একটা ল্যাং মারলো, আমি পড়ে গেলাম, আর ও হাসতে লাগলো হো হো করে। ভেবে দ্যাখো, একজন লোককে শুধু ফেলে দিয়ে আনন্দ করা উচিত। আমি উঠে দাঁড়িয়ে রেগেমেগে বললাম, বাঁদর কোথাকার? তারপর থেকে ওর এই অবস্থা। কিন্তু ঐটুকু দোষ করার জন্য তো ওর সারাজীবন বাঁদর হয়ে থাকা উচিত নয়। তুমি ওর খাঁচার কাছে গিয়ে ওই নাম ধরে ডাকো তো?

দীপু বাঁদরের খাঁচাটার কাছে গিয়ে ডাকলো, সুবোধ! সুবোধ!

বাঁদরটা দারুণ ছটফট করতে লাগল খাঁচার মধ্যে। মনে হয় ও ওর নাম শুনে চিনতে পেরেছে।

ছাগল, বেড়াল, আর হরিণ ছানাটাও এমনভাবে দীপুর দিকে তাকিয়ে আছে যেন ওরাও মানুষের ভাষা বোঝে।

দীপুর গা ছমছম করতে লাগলো। এরকম অদ্ভুত অবস্থায় সে কোনদিন পড়ে নি।

পিনাকপাণি বললেন, এইবার তোমায় আসল কথাটা বলি। তোমায় দেখেই বুঝেছি, তুমি খুব ভালো ছেলে। তুমি যদি আমার একটা উপকার করো, তোমায় আমি রাজা করে দেবো।

—কী উপকার করবো আমি?

—বলছি। তার আগে ঘরের কোণে ঐ যে একটা কাঠের বাক্সগুলি দেখছো? ওর মধ্যে মোহর ভর্তি আছে, ঐ সব মোহর তোমার হবে। সব আমি তোমাকে দিতে চাই।

—আমায় কী করতে হবে বলুন আগে।

পিনাকপাণি শার্টের তলায় হাত দিয়ে কোমর থেকে একটা লম্বা ছোরা টেনে বললেন, এই ছোরাটা নিয়ে আমার বুকে বসিয়ে দিতে হবে।

দীপু চোখ কপালে তুলে দারুণ একটা ভয়ের আওয়াজ করে বললো, অ্যাঁ?

পিনাকপাণি বললেন, তুমি ভাবছো, আমি ইচ্ছে করে মরতে চাইছি। না,

না, তা নয়। এছাড়া আর আমার অন্য কোন উপায় নেই। আমার মাথার মধ্যে মাঝে মাঝে কে যেন ফিসফিস করে কথা বলে। সেই কথার জন্য আমি জামসেদপুর ছেড়ে এখানে চলে এসেছি। সেই ফিসফিসে কথাই এই বাড়ীটা খুঁজে দিয়েছে। মাটির তলায় এ রকম যে ঘর আছে, তাও কি ছাই আমি জানতুম? সবই দিয়েছে সে। সে যে কে তা আমি অনেকদিন জানতে পারি নি। এখন বোধহয় খানিকটা। দ্যাখো, বাইরের আলো আমার সহ্য হয় না। যতদিন বাঁচবো আমাকে এই রকম মাটির নীচে থাকতে হবে। এরকম ভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী। আমার বুকে যদি তুমি এই ছুরিটা বসিয়ে দিতে পারো তাহলেই বোধহয় আমি বাঁচবো।

দীপু চীৎকার করে বললো, না। আমি কিছুতেই পারবো না।

—এসো, তোমায় আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

পিনাকপাণি আবার চলে এলেন পাশের ঘরে। তার শোবার খাটটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন দেওয়ালের এক দিকে।

সেই খাটের তলায় একটা মস্ত কাঠের বাক্স।

সেটা সাধারণ বাক্স নয়। ওপরে নানান রকম রূপোর কারুকার্য করা! বেশ পুরনো আমলের বাক্স বলে মনে হয়। সেটা প্রায় ঐ খাটের সমান।

পিনাকপাণি বললেন, ঐ বাক্সটা তুমি খুলে দেখো, দীপু।

—কী আছে ওর মধ্যে।

—খুলেই দ্যাখো না।

অতবড় বাক্স আমি খুলতে পারবো না।

—পারবে। ডালাটা ধরে টানলেই উঠে আসবে।

বাক্সটার কাছে গিয়েই ডালাটা ধরে ওঠাতেই দীপু ওরে বাবারে বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ডালাটা সে ছেড়ে দিল আবার। ধপ করে শব্দ হলো।

বাক্সের মধ্যে লাল ভেলভেটের বিছানায় শুয়ে আছে একটা মেয়ে। দারুণ ফর্সা রং, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখ দুটো নীল কাঁচের মতন। দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটির দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু চামড়া একটুও কুঁচকোয় নি।

দীপু ফ্যাকাশে মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, ও কে?

—আমি জানি না দীপু।

—আপনি ওর ওপরে খাটে শুয়ে থাকেন?

হ্যাঁ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। মাঝে মাঝে ডালা খুলে দেখি, ওর চেহারা একই রকম আছে। পচে যায় না, গলে যায় না। এখন বুঝতে পারি ঐ মেয়েটিই আমার মাথার মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে।

আমি আর থাকতে পারছি না। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি বাড়ী যাবো।

—না দীপু যেও না। তোমাকে আমার এই উপকার করতেই হবে। ঐ মেয়েটি আমার মাথার মধ্যে ফিসফিস করে বলে, আমার বুকে ছুরি বসাতে। কিন্তু আমি পারি না। কিছুতেই পারি না। অনেকবার চেষ্টা করেছি। তুমি আমাকে এই সাহায্যটুকু করো দীপু।

না—আ—আ বলে—এক চীৎকার দিয়ে দীপু দৌড়ালো, ঘর থেকে বেরিয়ে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। পিনাকপাণি তাকে ধরতে পারলো না।

খানিকটা উঠে দীপু পেছনে ফিরে দেখলো পিনাকপাণি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেও দুহাতে নিজের চোখ চেপে রয়েছে।

ওপরের দরজাটা ঠেলে দীপু বেরিয়ে এলো বাইরে। তারপর দ্রুত ছুটে রাস্তায়। গাড়ি টাড়ি কিচ্ছু গ্রাহ্য না করে দীপু একইভাবে ছুটতে ছুটতে চলে এলো বাড়ীতে।

দীপুর মা সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে এত দেরী করলি কেন। পাউরুটি কোথায় গেল? আনলি না?

দীপু হতভম্বের মতন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। কোনো উত্তরই দিতে পারলো না।

তারপর আমতা আমতা করে বললো, পাউরুটিটা হাত থেকে পড়ে গেল, আর তুললাম না গড়িয়ে গেল ময়লার মধ্যে।

মা বললেন, বেশ করেছিস। ময়লা থেকে কে তোকে তুলতে বলেছে? কিন্তু দেরী হল কেন?

দীপু কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে মা ভাবলেন, পাউরুটিটা নষ্ট করে দীপু বুঝি লজ্জায় পড়ে গেছে। তাই আর কিছু বললেন না।

দীপু নিজের ঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসে রইলো।

বাইরে যখন যা দেখে সে বাড়িতে এসে মাকে বলে। কিন্তু আজকের

ঘটনাটা বলা যায়? একটা কথাও কেউ বিশ্বাস করবে, সব কিছুই যেন দারুণ অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য।

রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে দীপু ভাবতে লাগলো, সত্যিই কি আজ এইসব হয়েছে! সত্যিই কি সে রাস্তায় একটা অন্ধ লোককে দেখেছিল? সত্যিই মাটির নীচের অন্ধকার ঘরে কয়েকটা ছেলে-মেয়ে বাঁদর, ছাগল, বেড়াল আর হরিণ হয়ে আছে?

নাকি সবই স্বপ্ন!

বিছানায় শুয়ে দীপু ছটফট করতে লাগলো, আজ একটা বিকেলের ঘটনায় যেন তার জীবনটা বদলে দিয়েছে।

সবচেয়ে ভয়ংকর সেই খাটের তলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে শুয়ে থাকা মেয়েটি। লাল ভেলভেটের বিছানা, নীল রঙা শাড়ী পরা সেই মেয়েটিকে মনে হয় পুতুলের মতন। কিন্তু পুতুল নয়। উনিশ কুড়ি বছর বয়েসের একটি মেয়ে, যেন কিছুক্ষণ আগেই জীবন ছিল, চোখ দুটো শুধু কাচের মতন।

সারারাত দীপুর ঘুম হলো না।

সকালবেলা মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর মুখটা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেনরে?

দীপু বললো, না, কিছু হয় নি।

একবার দীপুর ইচ্ছে হলো, সব কথা মাকে বাবাকে বলে দেয়।

কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই হাসবেন। দীপুকে পাগল ভাববেন।

সে সব কিছু ভুলে থাকার জন্য দীপু বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গেল। কিন্তু খেলতেও মন বসে না। বন্ধুদেরও কিছু বলতে পারে না।

তিনদিন পর দীপুর মনে হলো ব্যাপারটা বুঝি স্বপ্নই। ওরকম অসম্ভব গাঁজাখুরি ব্যাপার আবার হয় নাকি?

একটা বাঁদরের সামনে সে সুবোধ সুবোধ বলে ডাকছিল, এমনি বাঁদরটা সাড়া দিয়েছিল। বাঁদরটা নিশ্চয়ই পোষমানা। ঐ ডাক ওকে শেখানো হয়েছে!

আগেকার দিনে মুনি ঋষিরা অভিশাপ দিয়ে লোকজনকে হঠাৎ ভেড়া কিংবা গরু কিংবা সাপ বানিয়ে দিতেন। আজকাল কী আর তা হয়। লোকটা পাগল নিশ্চয়ই। কিন্তু বাক্সের মধ্যে ঐ মেয়েটা?

নাঃ দীপু আর ঐসব কথা ভাবতে চায় না।

চারদিন পর বিকেলবেলা দীপু ইস্কুল থেকে ফিরছে। বন্ধুদের সঙ্গে সে মনোহর পুকুরের মোড় পর্যন্ত আসে, বাকি রাস্তাটা একলা। আপন মনে সে হাঁটছে, হঠাৎ পেছনে খটখট আওয়াজ হতে সে চমকে পিছনে ফিরে তাকালো।

সেই লোকটা।

সেই পিনাকপাণি। সেই রকমই অন্ধ সেজে লাঠি ঠকঠকিয়ে আসছে। চোখে কালো চশমা।

এখন সে অন্ধ সেজে আছে, এখন আর দীপুকে দেখতে পাবে না।

দীপু দৌড়াতে লাগলো।

একটুক্ষণের মধ্যেই দীপু রাস্তার বাঁকে চলে গেল। তারপরে থমকে গিয়ে একটা বাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উঁকি মারলো।

পিনাকপাণিও সেই পথের বাঁকে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর ফিসফিস করে ডাকলো, দীপু দীপু।

দীপু একেবারে কুঁকড়ে গেল ভয়ে। লোকটা কি অন্ধ অবস্থাতেও দেখতে পায়?

সে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে মারলো টেনে দৌড়।

বুদ্ধি করে দীপু নিজের বাড়ীতে না গিয়ে কাছেই তার বন্ধু সুজিতের বাড়ী ঢুকে পড়লো। ঐ লোকটাকে সে নিজের বাড়ী চেনাতে চায় না।

সুজিতদের বাড়ীর দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলো, পিনাকপাণি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তারপর যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল পার্কের দিকে।

পরদিন ইস্কুলে টিফিনের সময় বেরিয়ে আলুকাবলি খেতে গিয়ে দীপু দেখলো রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিনাকপাণি।

দীপু সুট করে ঢুকে এলো ইস্কুলের মধ্যে। তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। লোকটা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকটা তাকে সহজে ছাড়বে না।

এখন উচিত লোকটাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া।

পুলিশ ওর বাড়ী সার্চ করলেই সব কিছু পেয়ে যাবে।

এই কথা ভাবতেই দীপুর শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। পিনাকপাণি মনের কথা বুঝতে পারেন। দীপু ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার কথা ভাবছে এই কথা জানতে পেরে পিনাকপাণি যদি তাকেই বাঁদর কিংবা ছাগল করে দেন?

না, না, দীপু একথা কিছুতেই মনে আনবে না। এবার সে বাঁদর কিংবা

ছাগল হয়ে গেলে কেউ তো তাকে মানুষ করে দিতে পারবে না। এমনকি পিনাকপাণি নিজেও পারবে না।

স্কুল ছুটির পর দীপু দেখলো পিনাকপাণি তখনো দাঁড়িয়ে আছেন উল্টো দিকে।

দীপু একদল বন্ধুর মধ্যে মিশে রইলো। মনোহর পুকুরের মোড়ে এসেও তিন চারজন বন্ধুকে বললো চল আমাদের বাড়ী যাবি এখন একটু? আমার মা পায়েস বানিয়েছেন, তোদের খাওয়াবো।

পিনাকপাণি পেছন পেছন ঠকঠকিয়ে আসছেন ঠিক।

দীপু বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ীতে ঢুকে গেল। পিনাকপাণি রাস্তার ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

সেদিন রাত্তিরবেলা খেতে বসে দীপু বাবাকে বললো বাবা, আমি কয়েকদিনের জন্য চন্দননগরে যাবো? ছোট মাসীর বাড়ীতে।

বাবা বললেন, হঠাৎ? এখন চন্দননগরে যাবি কেন?

—তুমি যে আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিলে?

—ছুটি পড়ুক। এখন ইস্কুল খোলা, এখন যাবি কী করে?

—আজ তো শুক্রবার। কালকের যদি ছুটি নিই, তাহলে শনি আর রবি দু'দিন অন্তত চন্দননগরে কাটিয়ে আসতে পারি।

দীপু মনে মনে ভেবে রেখেছে, একবার চন্দননগরে গিয়ে পড়লে সে আর দশবারোদিনের মধ্যে ফিরবে না। ছোট মাসীকে বলবে, যাতে তিনি জোর করে তাকে আটকে রেখে দেন। ছোটমাসীর সঙ্গে তার খুব ভাব।

বাবা বললেন, হঠাৎ এখন চন্দননগরে যাবার এত গরজ কেন? পড়াশুনা নষ্ট করে এখন যেতে হবে না। গরমের ছুটি পড়ুক, তখন নিয়ে যাবো।

দীপু নিরাশ হয়ে গেল।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সে ভাবলো, কাল ইস্কুলে যাবার নাম করে সে একাই চন্দননগরে পালাবে। সেখানে যাওয়া তো খুব সোজা। হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লেই হলো। চন্দননগর স্টেশনের খুব কাছেই ছোটমাসীর বাড়ী। যাবার আগে সে বাড়ীতে একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে।

কিন্তু পরদিন সকালে বাবা নিজেই বললেন, আচ্ছা চল, দীপু, তোর যখন

এত শখ হয়েছে, তোকে চন্দননগরেই রেখে আসছি আজ। ওখানে গিয়ে পড়াশুনা করতে হবে কিন্তু। ফাঁকি দিলে চলবে না।

বাবার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হলো দীপু।

সে যে কোন উপায়েই কিছু দিনের জন্য এ বাড়ী ছেড়ে যেতে চাইছিল। রাস্তায় বেরুলেই সেই অন্ধ লোকটিকে, দেখতে হবে, একথা ভাবলেই তার বুক ধড়ফড় করে।

চন্দননগরে ঠিক এগারো দিন থেকে এলো দীপু। আর এই কটা দিন তার দারুণ আনন্দে কাটলো। ছোটমাসীর বাড়ীর পেছনে রয়েছে একটা বাগান আর পুকুর। সেখানেই সারাদিন কেটে যায় এই সুযোগে তার সাঁতারটা শেখা হয়ে গেল।

পিনাকপাণির কথা মনে পড়লেই—সে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। না, ঐ লোকটির কথা সে আর কিছুতেই ভাববে না।

এগারো দিন পর বাবা এসে জোর করে নিয়ে গেলেন দীপুকে। এর আগে সে কখনো একটানা এতদিন ইস্কুল ফাঁকি দেয় নি।

পরদিন ইস্কুল যাবার সময় সে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। না, পিনাকপাণিকে কোথাও দেখা গেল না। টিফিনের সময়ও নেই। ছুটির সময়েও না।

যাক পিনাকপাণি নিশ্চয়ই তাহালে ভুলে গেছেন দীপুকে।

পরপর চারদিন দীপু নিশ্চিতভাবে রাস্তা দিয়ে ঘোরাফেরা করলো খুব নিশ্চিতভাবে পিনাকপাণির কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। তার মনে হলো, আর কোনোদিন দেখা হবে না পিনাকপাণির সঙ্গে। বাবা, পৃথিবীতে এত অদ্ভুত মানুষও থাকে।

শুধু বারবার দীপুর মনে পড়ে সেই খাঁচার বন্দী ছাগল, বাঁদর, বেড়াল আর হরিণ শিশুটির কথা। ওরা যদি মানুষ হয় সত্যিই, তাহলে সারা জীবন ওরা ঐ রকম হয়েই থাকবে? ইস, ও[illegible] বা মায়েরা নিশ্চয়ই কত চিন্তা করে।

খবরের কাগজে সে প্রায়ই ছেলেমেয়েদের নিরুদ্দেশের খবর থাকে, হয়তো সেই সব ছেলেমেয়েদের কয়েকজন ঐ সেই মাটির নীচের ঘরে জন্তু হয়ে গেছে।

এক বন্ধুর জন্মদিন ছিল শনিবার। সেখানে নেমতন্ন খেয়ে ফিরছে দীপু, এমন সময় লোডশেডিং হয়ে গেল।

সমস্ত রাস্তা ঘরঘুট্টি, অন্ধকার।

সাবধানে সে পা টিপে হাঁটছে এমন সময় হঠাৎ কে যেন তার কাঁধে হাত দিল।

তারপর ফিসফিস করে ডাকলো, দীপু, দীপু।

দীপুর শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। গলার আওয়াজ শুনেই সে চিনতে পেরেছে।

শরীরটা মুচড়ে কোনো রকমে কাঁধটা ছাড়িয়ে নিয়ে দীপু চেষ্টা করলো কোনো রকমে দৌড়ে পালাবার। কিন্তু পিনাকপাণি তাকে ধরে আছেন লোহার মত শক্ত করে।

দীপু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, আমায় ছেড়ে দিন।

পিনাকপাণি বললেন, দীপু, আমার হাত ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো না। আমি কি ইচ্ছা করলে তোমাকে একটা বেড়াল বা টিয়াপাখি করে দিতে পারি না। কিন্তু তা তো করিনি, দীপু। আমি তোমাকে পছন্দ করি বলেই তোমার ক্ষতি করতে চাই না। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

দীপু বললো, আমাকে এক্ষুনি বাড়ীতে ফিরতে হবে। আমার ভীষণ কাজ আছে।

—তুমি ভয় পাচ্ছো? বললাম যে, তোমার ভয় নেই।

দীপু একবার ভাবলো চেঁচিয়ে উঠবে। রাস্তায় অনেক লোক আছে। অন্ধকার হলেও লোকেরা এসে তাকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে দিবে।

পিনাকপাণি বললেন, চেঁচিয়ে লাভ নেই, দীপু। আমার চোখ আজ খোলা। পকেটে টর্চ আছে। ইচ্ছে করলেই একবার তোমার ওপর ফেলে তোমাকে একটা বেড়াল বানিয়ে কোলে করে নিয়ে যেতে পারি। রাস্তার লোক কিছু বুঝতে পারবে না।

দীপু বললে, আমার কাঁধে লাগছে।

পিনাকপাণি বললেন, আমায় রাগিয়ে দিও না, দীপু।

রাগিয়ে দিও না। একবার কিছু হলে আর যে ফেরাতে পারবো না।

দীপু সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, আমি যাচ্ছি চলুন।

দীপুর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে একটা হাত চেপে ধরে পিনাকপাণি সেই অন্ধকারের মধ্যেই গটগট করে হাঁটতে লাগলেন।

আগের দিন দীপু ওঁর হাত ধরে বড় রাস্তা পার করে দিয়েছিল। আজ পিনাকপাণিই দীপুকে নিয়ে গেলেন রাস্তার ওপারে।

অন্ধকারের মধ্যেই পিনাকপাণির হাঁটতে কোনো অসুবিধেই হয় না। জলের মাছ যেমন জলের মধ্যে স্বাভাবিক, সেই রকম পিনাকপাণিও যেন অন্ধকারেরই প্রাণী।

হাজরা পার্ক হয়ে গলির মধ্যে এসে পিনাকপাণি সেই বাড়ীটাতে ঢুকলেন। সিঁড়ির নীচে মেঝের সঙ্গে আটকানো দরজার এক পাল্লা খোলাই ছিল, সেখান দিয়ে তরতর করে নেমে ওরা চলে এলো নীচে।

পিনাকপাণি ঘরের মধ্যে ঢুকে নীল আলোটা জ্বাললেন।

বাইরে লোডশেডিং থাকলেও ওখানে ঠিকই আলো জ্বলছিল। বোধ হয় এখানে অন্য ব্যবস্থা আছে।

পিনাকপাণি একটা চমৎকার ছোট কাঠের বাক্স দীপুর হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমাকে দেবো বলেই খুঁজছিলাম! তুমি এটা নাও। দীপু বাক্সটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—খুলে দেখো।

দীপু বাক্সটা খুললো। মনে হলো যেন ভেতরে অনেকগুলো পেতলের গোল গোল চাক্তি ঘুরছে।

—এগুলো কী জানো?

—না।

—ওগুলো সোনার মোহর। এক একটা মোহরের দাম অনেক। এই সব মোহর এখন তোমার। এই মোহরগুলি মাটির তলায় এই ঘরে ছিল, এগুলো কার আমি জানি না। আমার তো কোনো কাজে লাগবে না। আমি আর বাঁচবো না।

দীপুর গলা শুকিয়ে গেছে। এতগুলো মোহর পেয়ে সে কী করবে বুঝতে পারছে না। এগুলো নেওয়া কি তার উচিত?

পিনাকপাণি দীপুর সঙ্গে মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, ওগুলো আমি তোমায় উপহার দিয়েছি, দীপু একদিন আমায় রাস্তা পার করে দিয়েছিলে, আর কেউ কোনদিন দেয় নি।

—কিন্তু আপনাকে তো আর পার করে দেবার দরকার ছিল না। আপনি নিজেই তো পার হতে পারেন?

—তুমি তো সে কথা জানতে না? তুমি তো সত্যিকারের একজন অন্ধলোক ভেবেই রাস্তা পার করে দিতে চেয়েছিলে। তাতেই বুঝছি তোমার মনটা খুব ভালো।

দীপু বারবার খাটের তলাটার দিকে চাইছে বলে পিনাকপাণি বললেন, তুমি ভাবছো, এখনো সেই মেয়েটা ওখানে আছে কি না? হ্যাঁ আছে। ঐ মেয়েটাই তো আমায় পাগল করে দিচ্ছে। তুমি দেখবে?

দীপু বললো, না, না, আমি দেখতে চাই না।

পিনাকপাণি শুনলেন না। খাটটা সরিয়ে ফেললেন। তারপর নিচের বাক্সের ডালাটা খুলে চীৎকার করে বললেন, কেন, তুমি আমাকে মারতে চাও?

দীপু দেখলো মেয়েটির ঠিক একই রকম চেহারা রয়েছে। খুব তাজা। চোখ দুটো কাঁচের মতন।

পিনাকপাণি দেয়ালে হেলান দিয়ে বললেন, আগে আমি পাগল ছিলাম না, দীপু। আগে আমি ছিলাম জামসেদপুরের বিজন বসু। চাকরি বাকরি করতাম, বউ ছেলেমেয়ে ছিল, হঠাৎ একদিন আমি পিনাকপাণি হয়ে গেলাম। আমার মাথার মধ্যে কেউ ফিসফিস করে কথা বলে। এই মেয়েটাই বলে। আমি বুঝতে পেরেছি। আগে ফিসফিস করে নানারকম কথা বলতো। এখন শুধু একটাই কথা বলে আমাকে মরতে বলে।

দীপু বললো, আপনি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারেন না?

—কোথায় যাবো?

—অনেক দূরে। এই মোহরগুলো আপনি নিন।

—তা হয় না দীপু। আমি জানি, কোথাও গিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। আমার চোখটা বদলে গেছে। পৃথিবীর আলো আমি সহ্য করতে পারি না। মাঝে মাঝে অন্ধ সেজে চোখ বন্ধ করে যাই। আগে তবু একটু একটু করে চোখ খুলতে পারতাম, এখন আর দিনের আলোতে কিছুতেই চাইতে পারি না। চোখে ভীষণ জ্বালা করে।

—তা হলে অন্ধ সেজেই থাকবেন। কত লোক তো এমনিতেই অন্ধ, তবু, তো তারা ভালোভাবেই বেঁচে থাকে।

—আমি তা পারবো না। মাথার মধ্যে সব সময় ফিসফিস আওয়াজ। যেখানেই যাই ঐ আওয়াজ আমাকে ছাড়বে না, হয় আমাকে পাগল করে

দেবে কিংবা এখানে টেনে আনবে। তুমি চন্দননগরে গিয়েছিলে, সেখানেও আমি তোমার খোঁজ পেলুম—'

আমি চন্দননগরে গিয়েছিলাম, তাও আপনি জেনে ফেলেছিলেন?

'হ্যাঁ, এই ক্ষমতাও আমার নতুন হয়েছে। আমি একবার যাকে দেখি, তার মনে সব কথা ছবির মতন দেখতে পাই। চন্দননগরে একটা হোটেল ভাড়া করেছিলাম। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারলাম না রাত্তিরে। মাথার মধ্যে ফিসফিসে আওয়াজ বার বার বলতে লাগলো, ফিরে এসো ফিরে এসো। ঠিক যেন চুম্বকের টানে ফিরে এলাম।

কোমর থেকে সেই ছোরাটা বার করে পিনাকপাণি বললেন, এই আওয়াজটা রোজ আমাকে বলছে, এই ছোরাটা দিয়ে আত্মহত্যা করতে। আমি এই ছোরাটা হাজরা পার্কে মাটি খুঁড়ে পুঁতে এসেছিলাম। নিজের কাছে রাখতে চাই নি। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে নিজেই আবার সেটাকে তুলে নিয়ে এলাম। পারলাম না, বুঝলে দীপু। পারলাম না।

দীপুর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। কাঠের বাক্সটার ডালাটা খোলা। সেই মেয়েটার দিকে যতবার চোখ যাচ্ছে, ততবারই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ভয়ে ভয়ে। একটা মরা মেয়ে কতদিন ধরে ঐ বাক্সটার মধ্যে রয়েছে কে জানে। পচে না। গলে না।

আর পিনাকপাণির হাতে ঐ অতবড় ছোরা। ওঁর চোখ দুটো এখন সত্যিই যেন পাগলের মতন মনে হচ্ছে। দীপু যদি এখনো পালিয়ে যেতে পারতো।

পিনাকপাণি বললেন, ব্যাপারটা আমি অনেকটা আন্দাজ করতে পারছি। অনেকদিন আগে মনে হয় কয়েক জন্ম আগে পিনাকপাণি নামে একটা লোক মেয়েটিকেই বোধহয় খুন করেছিল। তারপর পিনাকপাণিও অন্য কোথাও গিয়ে মারা যায়, ওদের দু'জনের আত্মাই মুক্তি পায়নি। এই পৃথিবীতে একজন আর একজনকে তাড়া করে ফিরছে। তারপর পিনাকপাণি বোধহয় আমার অর্থাৎ বিজন বসুর শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

দীপু বললো আমি এবার যাবো?

—না দীপু তোমার সাহায্য যে আমার খুব দরকার।

—আপনি আমাকে দয়া করুন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কিছুতেই পারবো না।

—আমি নিজেও যে পারছি না দীপু। মরতে আমাকে হবেই। কিন্তু নিজে কি নিজের বুকে ছুরি বসানো যায়? অনেকবার চেষ্টা করেও পারি নি।

—আমি পারবো না। কিছুতেই পারবো না।

—কেউ তো এখানে দেখবে না। কেউ এখানে আমাদের খুঁজে পাবে না। তুমি পালিয়ে যেও। ওপরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে কেউ কোনো দিন আর আমাদের খুঁজে পাবে না।

—না, না, না!

—তুমি এক কাজ করো দীপু শুধু একটা কাজ—

—না, না আমার পাপ হবে।

—হবে না, তোমার পাপ হবে না। সব পাপ আমার।

পিনাকপাণি দীপুকে জোর করে টেনে এনে একটা দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর ছোরাটা দীপুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো—

দীপুর কিছু বোঝবার আগেই পিনাকপাণি দীপুর হাতের ছোরাটার ওপর ওপর বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ছোরাটা ওঁর বুকে গেঁথে গেল।

পিনাকপাণি একটুও শব্দ করলেন না। সেই রকম ছোরা বেঁধা অবস্থাতে কোনো ক্রমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, এই বার তোমার ছুটি—দীপু—তুমি যাও—এবার আমারও ছুটি।

তারপর পেছন ফিরে টলতে টলতে এক পা এক পা করে সেই কাঠের-বাক্সটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, এইবার আমি এসেছি—আমি এসেছি।

রক্তমাখা বুক নিয়ে পিনাকপাণি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মরা মেয়েটির ওপর।

অমনি মেয়েটি উঠে বসে বিকট গলায় হি হি হি হি করে হেসে উঠলো।

দীপু আর সহ্য করতে পারলো না। ঝুপ করে সেখানেই পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

কতক্ষণ সেভাবে অজ্ঞান হয়েছিল, দীপু জানে না। পরে জ্ঞান ফিরলো কয়েকটি ছেলেমেয়ের চীৎকারে। কোথায় যেন কারা খুব ভয় পেয়ে কাকে ডাকছে।

দীপু চোখ মেলে দেখলো পিনাকপাণির মৃতদেহটা পড়ে আছে, মাটিতে। কিন্তু কাঠের বাক্সের মধ্যে সেই মেয়েটি নেই, সে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দীপু কোনক্রমে উঠেই দৌড় লাগাতে গেল। তখন সে বুঝলো, চ্যাঁচামেচি আসছে পাশের ঘর থেকে।

সেই ঘরটাতে খাঁচাগুলোর মধ্যে ছাগল, বাঁদর, বেড়াল বা হরিণ আর নেই। বরং দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে বন্দী।

দীপু এক হ্যাঁচকা টানে খাঁচার দরজাগুলো খুলে দিতেই ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে এলো।

ওরা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো আমারা কোথায়? কে আমাদের এখানে আটকে রেখেছে?

দীপু বললো, ওসব কথা জিজ্ঞেস করবার এখন সময় নেই শিগগির পালাও।

দীপু মোহরের বাক্সটা তুলে নিয়ে নিজেই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো বাইরে। তারপর সে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে গেল।

মোহরের বাক্সটা দীপু খুব গোপনে লুকিয়ে রেখেছে। আজও কোনো কথা সে মাকে বলে নি। অন্তত চার পাঁচ বছর কেটে না গেলে, সে কারুকে কিছু জানাতে চায় না।

কাঠের বাক্সের সেই মেয়েটি যে কোথায় গেল, দীপু এখনো তা জানে না। এখনো সেই মেয়েটির হাসির কথা ভাবলে তার বুক গুড়গুড় করে।

পিনাকপাণির জন্য তার মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। পিনাকপাণিই হোক বা বিজনকুমার বসুই হোক, লোকটি খারাপ ছিল না। তবে পিনাকপাণি মরে গিয়েছিল বলেই যে ছাগল, বাঁদর, বেড়ার আর হরিণরা আবার মানুষ হয়ে গেল, একথা ভেবে দীপুর আবার মনে হয় লোকটা মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে।

খরগোসগুলোর কী অবস্থা হয়েছিল। তা আর দীপু দেখেনি। তবে ওরা মানুষ ছিল না নিশ্চয়ই। তাহলে পিনাকপাণি বলতেন। হয়তো অন্য কোন জানোয়ার। তারা শেষ পর্যন্ত খাঁচাতেই বন্দী থেকে গেছে?

অন্ধকারে গোলাপ বাগান

সাড়ে সাতটার সময় মাস্টারমশাই আসবেন, ঠিক সাতটা বেজে কুড়ি মিনিটে আলো নিভে গেল। এখন লণ্ঠন জ্বালতে হবে। ঘরে তিনতলার ঠিক জানালার ধারেই সুজয়ের পড়ার টেবিল। সে সেখানেই বসে রইল চুপ করে। জানালার বাইরে গোটা কলকাতাটাই অন্ধকার। দোতলায় মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। মা শিবুকে বললো হ্যারিকেন জ্বালতে। শিবু বললে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না। রোজই এই রকম হয়। আলো নিভে গেল তখন আর দেশলাই কিংবা টর্চ খুঁজে পাওয়া যায় না সুজয়দের বাড়ীতে। একটা চার ব্যাটারির বড় টর্চ আছে। খুব জোর আলো হয়। সেই টর্চটা কোথায়?

সুজয় চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলো। চোখ বুজলে সে অনেক কিছু দেখতে পায়।

কিন্তু চোখ বুজে সুজয় একটা অন্য দৃশ্য দেখল। ঠিক যেন সিনেমার ছবির মতন...

...অন্ধকারে মাঠের মধ্য দিয়ে টর্চ হাতে হেঁটে আসছে একজন লোক...লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, টর্চের আলোয় মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে

শুধু লোকটির পায়ে সাদা কেড্‌স জুতো, তার প্যান্টের রং হলদে...লোকটি হাঁটছে খুব তাড়াতাড়ি, টর্চের আলো পড়ছে এদিক ওদিক...

...মাঠতো নয়, ওটা একটা বাগান। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নানারকম ফুল গাছ, লোকটি এক একটি গাছের ওপরে আলো ফেলে দেখছে, তারপর আলোটা একটি গোলাপ ফুল ফুটে আছে সেই...গাছে।

এবার লোকটি হাঁটু গেড়ে বসলো সেই গাছটির কাছে। এখনো লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, গায়ে একটা ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট—হাঁটু গেড়ে বসা লোকটির প্যান্টের পকেটে ডান হাতটা ঢোকানো, তারপর কী যেন একটা জিনিস বার করে আনলো—

সুজয়ের বুকটা ধক্ করে উঠলো...লোকটার হাতে ওটা কী? টর্চটা মাটিতে রাখলো, তারপর দু'হাত দিয়ে সেই জিনিসটা আলোর সামনে আসতেই দেখা গেল সেটা একটা গোটানো ছুরি, সেটার ফলাটা টেনে খুলে ফেলতেই ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো আলোয়...দূরে একটা কুকুর ডাকছে...ডাকতে ডাকতে কুকুরটা যেন এগিয়ে আসছে কাছে...

—এই যে হ্যারিকেন এনেছি।

সুজয় চমকে উঠতেই ঘোর কেটে গেল তার। শিবু হ্যারিকেন নিয়ে এসেছে। সুজয়ের একটু রাগ হলো। ইস্ নষ্ট হয়ে গেল ছবিটা।

একতলায় একটা কুকুর ডাকছে। এতো চেনা ডাক। সুজয়ের নিজের কুকুর ডুংগা জাত এ্যালসেসিয়ান, খুব শান্ত কুকুর, তবু লোক দেখলে ভয় পায়। ডুংগা সহজে ডাকে না। এখন হঠাৎ ডাকছে কেন?

—আর একটু পরে আলোটা আনতে পারলে না?

শিবু বললো, ওমা, তুমি অন্ধকারে বসে থাকবে, মা বললেন,শিগ্‌গির হ্যারিকেনটা দিয়ে আয়। খোকাবাবু অন্ধকারে ভয় পাবে।

সুজয় বললো হুঁ, আমি অন্ধকারে ভয় পাবো, এই ডুংগা ডাকছে কেন রে?

—নিশ্চয়ই কোনো ছাতাওয়ালা বাবু এসেছে।

তা ঠিক। ডুংগা একদম ছাতা পছন্দ করে না। কারুর হাতে ছাতা দেখলেই বিরক্ত প্রকাশ করে।

—যা তো নিচে গিয়ে দেখে আয়!

শিবু চলে যেতেই সুজয় ভুরু কুঁচকে বসে রইলো। হঠাৎ চোখ বুঝে সে ঐ

দৃশ্যটা দেখলো কেন? কোনো সিনেমায় কি শিগ্‌গিরই এরকম কোনো দৃশ্য দেখেছে? না তো! কোনো গল্পের বইতে পড়েছে? তাও না! অন্ধকারের মধ্যে বাগানে একটা লোক, একটা গোলাপ গাছের সামনে ছুরি হাতে নিয়ে বসা—লোকটার মুখ দেখা যায় নি...লোকটা কি ছুরি দিয়ে গোলাপ গাছটা কেটে ফেলবে? কেন?

সুজয় আবার চোখ বুজলো। যদি বাকি অংশটা দেখা যায়। কিন্তু এবার কিছুই দেখা গেল না। এমনি চোখ বুজলে যে-রকম হয় সেই রকম।

হ্যারিকেনের আলোটা খুব কমিয়ে টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে আবার চোখ বুজে দেখার চেষ্টা করলো সুজয়। এবারও দেখা গেল না কিছুই।

দরজার কাছে আওয়াজ হতেই সুজয় চোখ তুলে তাকালো। মাস্টারমশাই এসেছেন। হাতে একটা ছাতা।

—কী সুজয়, হ্যারিকেনটা নামিয়ে রেখেছো কেন?

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারিকেনটা তুলে বললো, আসুন তপনদা আপনি আজ আবার ছাতা নিয়ে এসেছেন?

সুজয় পড়ে ক্লাস নাইনে। তার মাস্টারমশাই সবেমাত্র এম. এ. পাশ করেছেন। প্যান্ট-শার্ট পরেন আর খুব লবঙ্গ খেতে ভালবাসেন তাই সব সময় মুখে লবঙ্গ।

মাস্টারমশাই বললেন, বাঃ, বৃষ্টি হলেও ছাতা আনতে পারবো না? তোমার কুকুর একেবারে ঘেউ ঘেউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চেনে এতদিন ধরে দেখছে...

এই ডুংগা যে সুজয়ের কতবড় বন্ধু তা তো মাস্টারমশাই জানেন না। ডুংগার মনে কোনো কষ্ট হলে সুজয় সহ্য করতে পারে না।

বৃষ্টি হচ্ছে বুঝি?

—আমাদের পাড়ায় তো তুমুল বৃষ্টি। তোমাদের এখানেও টিপ টিপ করে শুরু হয়েছে।

সুজয় জানালা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখলো, সত্যিই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

অমনি সুজয়ের মনে পড়লো, অন্ধকার বাগানে যে লোকটা সাদা কেড্‌স পড়ে হাঁটছিল, তার জুতোয় কোন কাদা ছিল না।

চেয়ার চেনে বসে মাস্টারমশাই বললেন, যে অঙ্কগুলো দিয়েছিলাম, করেছো?

সুজয় খাতা বার করলো। কিন্তু পড়াশুনায় আজ তার মন বসছে না। যদিও সামনেই পরীক্ষা।

এক সময় মাস্টারমশাই বললেন, এ কি, সুজয়, মন দিচ্ছো না কেন? কতবার বলছি লিখতে, তুমি পেনসিল হাতে বসে আছো।

সুজয় লজ্জা পেয়ে বললে, ও! এই যে লিখছি। কী যেন বলছিলেন তপনদা?

মাস্টারমশাই বললেন, তোমার আর দোষ কী; এই হ্যারিকেনের আলোতে কি আর পড়া যায়। পাখা বন্ধ, যা গরম, পরশু তো রবিবার, সেদিন দুপুরে আসবো...

এক ঘণ্টার মধ্যেই মাস্টারমশাই চলে গেলেন। ঠিক এর পরেই সুজয়ের খাবারের ডাক পড়ে।

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে রোজ খানিকক্ষণ ডুংগাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শহরের এ দিকটা এখনও অন্ধকার। বৃষ্টি এখনও টিপ টিপ পড়ছে। ডুংগা জলে ভিজতে চায় না। গায়ে একটু জল লাগলেই দু'কান লট্ পট্ করে গা ঝাড়া দেয় খুব জোরে। সুতরাং আজ আর ছাদে ঘোরা যাবে না।

সুতরাং ডুংগাকে নিয়ে সুজয় চিলে কোঠায় বসে রইলো। ডুংগা একবার করে বাইরে মুখ বাড়ায়, আর নাকে বৃষ্টি লাগলেই ফিরে আসে।

সুজয়ের আবার মনে পড়লো সেই দৃশ্যটা।

সুজয় মাঝে মাঝেই চোখ বুজে এরকম সব জিনিস দেখতে পায়। কখন যে দেখবে ঠিক নেই। এক একদিন কিছুই দেখে না।

দৃশ্যগুলো নানা রকম হয়। পাহাড়ের পাশের সরু রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে তিনজন ছেলে জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছ ভেঙে পড়লো মড় মড়িয়ে...। একটা ফুলের পাপড়ি দুলছে আস্তে আস্তে আর একটা মৌমাছি বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার পাশে...সোনারপুরে ওর ছোটমামার বাড়ীতে গোয়ালঘরে একটা শেয়াল ঢুকে বসে আছে, দুটো গরু ডাকছে হাম্বা হাম্বা...!

চোখ বুজে সুজয় যে দৃশ্যগুলি দেখে তা সে কিন্তু আগে সত্যি সত্যি দেখে নি কখনো। চোখ বুজলে দৃশ্যগুলি কোথা থেকে এসে যায় কে জানে। একবার

সে দেখেছিল, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সভায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন শিবাজী। একেবারে সিনেমার মতন স্পষ্ট।

এসব কথা অন্য কারুকে বললে তারা বিশ্বাস করে না। ইস্কুলের বন্ধুদের দু'একবার বলতে গেছে, তারা অমনি বলেছে, যা, যা, খুব গাঁজা দিচ্ছিল।

অনেকগুলো ঘটনা মিলেও যায়। সোনারপুর থেকে ছোটমামা এসে সুজয়ের মাকে বলেছিলেন, জানো মেজদি, পরশুদিন কী কাণ্ড কোথা থেকে একটা শেয়াল এসে আমাদের গোয়াল ঘরটায় ঢুকে পড়ে...।

সুজয় উত্তেজিতভাবে বলেছিল, জানি, আমি জানি, দুটো গরু ভয় পেয়ে খুব ডেকেছিল...

ছোটমামা ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, তুই জানিস, মানে? পরশু রাত্তিরের ব্যাপার, এর মধ্যে তো কেউ আসে নি সোনারপুর থেকে। সুজয় তবু বলেছিল, হ্যাঁ, আমি জানি, তোমরা সবাই মিলে তাড়া করলে...শেয়ালটা দৌড়ে পালাবার সময় একজন কে যেন লাঠি ছুঁড়ে মারলো, কিন্তু ওর গায়ে লাগে নি...।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, মেজদি তোমার ছেলেটা কিন্তু খুব গল্প বলতে পারে। আমি সেই শেয়ালের কথা বলেছি...

বিশ্বাস করে না, কেউ বিশ্বাস করে না। গল্প নয়, সুজয় যে ঐ দৃশ্যটা সত্যিই দেখেছিল পরশুদিন, তা কারুকে বিশ্বাস করানো যাবে না।

তা হলে, অন্ধকার বাগানে টর্চ হাতে লোকটি যে একটা গোলাপ ফুলের সামনে বসলো, সে দৃশ্যটাও সত্যি?

ওরকম গোলাপ বাগান কোথায় আছে? কলকাতায় কি থাকতে পারে? তা পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ কলকাতায় বৃষ্টি নেই...। তা হলে কি দূরে কোনো জায়গায়? সোনারপুরে ছোটমামার বাড়ীতে কি বাগান আছে? দু'মাস আগে সুজয় যখন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল, তখন দেখেছিল, ছোটমামাদের বাড়ির সামনে বেগুন গাছের ক্ষেত। এত তাড়াতাড়ি কি সেখানকার বেগুন গাছ তুলে গোলাপ ফুলের গাছ হতে পারে? নাঃ!

নীচে নেমে সুজয় মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা আমাদের চেনাশুনা কারুর বাড়ীতে ফুল বাগান আছে? এত বড় বড় গোলাপ ফুল ফোটে?

মা অবাক হয়ে বললেন, ফুল বাগান? কাদের ফুল বাগান আছে। হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

সুজয় বললে, না, এমনি...।

তিনতলার ঘরে সুজয় একলা শোয়। ঘুমোবার আগে সুজয় চোখ বুঝে অনেক চেষ্টা করলো সেই দৃশ্যটা আর একবার দেখবার। কিন্তু একবার স্বপ্ন ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না, সেইরকম সেই দৃশ্যটাও আর ফিরে এল না।

সকালবেলা মা সুজয়কে ডাকতে এসে দেখলেন, সুজয়ের ঘুমন্ত মুখে কীরকম যেন অস্বস্তির ভাব নেমে আছে। ভুরু দুটো কোঁকড়ানো যেন ঘুমিয়ে সে কিছু চিন্তা করছে।

একটু কি অন্যরকম দেখলেই মায়েরা প্রথমেই ভাবেন, ছেলের জ্বর হয়েছে কি না।

মা সুজয়ের কপালে হাত রাখলেন। না, জ্বর নেই তো।

—এই সুজয়, ওঠ।

দু'বার ডাকতেই সুজয় চোখ মেললো।

—হ্যাঁ রে, তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী ভাবছিলি?

—কই, কিছু না তো?

ঘুমের মধ্যে ভুরু কুঁচকেছিলি কেন? কোনো বাজে স্বপ্ন দেখেছিস বুঝি?

সুজয়ের কিছু মনে নেই। অনেক স্বপ্ন সকালে উঠে আর মনে পড়ে না। কিন্তু সুজয় জেগে জেগে চোখ বুজে যে দৃশ্যগুলো দেখে সেগুলো তার ঠিক মনে থাকে।

সুজয়ের স্কুল সাড়ে দশটায়। বাবা অফিস যাবার সময় সুজয়কে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান বলে সুজয়কে বাবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে নটার মধ্যেই বেড়িয়ে পড়তে হয়। সেইজন্য সকালের জলখাবার খেয়ে নেওয়ার পর একঘণ্টা পড়তে না পড়তেই তাকে যেতে হয় স্নান করতে।

পুরনো আমলের বাড়ী তো, তাই সুজয়ের ঘরটা বিরাট। এই স্নানের ঘরটা সুজয়ের খুব ভালো লাগে। দরজাটা বন্ধ করলে একা, একা, নিরিবিলি লাগে। এখানে অনেক কিছু চিন্তা করা যায়।

অবশ্য বাথরুমে বেশীক্ষণ কাটাবার উপায় নেই সকালে। বাবার অফিসের দেরি হয়ে যাবে। তিনি তাড়া দেবেন।

শাওয়ারটা খুলে দিয়ে সুজয় তার তলায় দাঁড়ালো। শাওয়ারের জল খুব তোড়ে পড়বার সময় আপনা থেকেই চোখ বুজে আসে। চোখ বুজতেই সুজয় আর একটা দৃশ্য দেখতে পেল।

...একটা খুব বড় বাড়ী, দোতলায় টানা বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো মতন লোক খুব রাগারাগি করছেন। দূরে দু'তিনজন লোক কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে...বুড়ো লোকটির বুকের লোম পাকা, শুধু একটা ধুতি পরা, বেশ বড় গোঁফ, হেঁড়ে গলায় তিনি চিৎকার করে বললেন, আমার চাবি কোথায়? আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে...।

সুজয় চোখ খুলে ফেললো। আর দেখা গেল না। ঐ বুড়ো লোকটি কে? ঐ বাড়ীটা কোথায়? সে কিছুই জানে না। তবু সে কেন দেখলে ঐ দৃশ্যটা? কোথায় কার চাবির গোছা হারিয়ে গেছে, তা নিয়ে সুজয়ের মাথা ঘামাবার কি দরকার?

কিন্তু ভুলতে চাইলেও সুজয় ভুলতে পারে না! খেতে বসেও সুজয়ের কানে বাজে সেই বুড়ো লোকটির চিৎকার, আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? আমার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে...।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল এক পীরিয়ড পরেই। ডিবেট কমপিটিশানে ক্লাশ টেনের একটি ছেলে ফার্স্ট হয়েছে। বাড়ী চলে এসে সুজয় শুয়ে রইলো নিজের ঘরে। এরকম দুপুর বেলা সুজয় কোনোদিন শুয়ে থাকে না, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায় কিংবা গল্প করে। বৃষ্টি বাদলা হলেও ঘরে বসে গল্পের বই পড়ে।

কিন্তু সুজয়ের শরীর ভালো লাগছে না। মনটা একটু ব্যাথা ব্যাথা করছে। সুজয় শুয়ে রইলো চোখ বুজে। এখন আর সে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আজ সকালে দেখা দৃশ্যটা মনে পড়ছে বারবার। কে ও বুড়ো লোকটা? সুজয় কোনোদিন ঐ রকম লোককে দেখে নি, খুব জোর দিয়ে বলতে পারে।

একটু পরেই তার বন্ধু অভিজিৎ এসে হাজির। অভিজিৎ অবশ্য স্কুলে পড়ে, আশ্চর্য তাদের স্কুলও আজ ছুটি। ওদের স্কুলের একজন টিচার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন।

অভিজিৎ উত্তেজিত ভাবে বললে, এই দমদম যাবি?

সুজয় বললো, দমদম হঠাৎ? দমদম যাবো কেন?

—দমদমে আমার মামার বাড়ী। বেশ আজ ওখানে থাকবো কাল চলে আসবো।

—কাল ইস্কুল যাবো না?—ধুৎ কাল তো রবিবার।

—রবিবার দুপুরে আমার মাস্টার মশাই আসবেন বলেছেন যে।

—কাল সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরে আসবো। বাবা অফিসের কাজে বহরমপুর যাচ্ছেন, আজ সন্ধ্যাবেলা অফিসের গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের দমদমে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। সকালে আমরা ফিরে আসবো বাসে করে, ঐ বাসে করে ফিরে আসার ব্যাপারটা শুনেই সুজয় বেশী উৎসাহ বোধ করছে। অনেকক্ষণ বাসে চাপলে সুজয়ের খুব ভালো লাগে। কত রকম মানুষ দেখা যায়।

মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে আগে।

অভিজিৎকে বসিয়ে রেখে সুজয় গেল মায়ের ঘরে। মা এই সময় উপন্যাস পড়েন। মায়ের পাশে বসে সুজয় খুব নরমভাবে বললো, মা একটা কথা বলবো?

মা বলবেন, পয়সা চাই বুঝি? পরশুদিন তোকে একটা টাকা দিয়েছিলুম না?

—না, মা, পয়সা না। অভিজিৎ এসেছে, বলছিল...।

একটু পরেই মা রাজি হয়ে গেলেন।

ওরা বেরিয়ে পড়লো বিকেল পাঁচটার মধ্যে। অভিজিৎদের মামার বাড়ী নাগেরবাজার ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। পৌঁছোতে বেজে গেল সাড়ে ছটা। তখন সন্ধ্যে নেমেছে।

সুজয়ের বাবা গাড়ি থেকে নামলেন না, গেটের কাছে ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গাড়ি ঘুরিয়ে।

মস্ত বড় লোহার গেট, সামনে খানিকটা লন, সামনের দিকে সুরকি বেছানো রাস্তা। গেটটা খুলতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো অমনি দোতলা থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে?

অভিজিৎ বললো, আমি।—আমি কে?

—আমি অভিজিৎ...খোকন। দাদু, আমি খোকন, বালিগঞ্জ থেকে এসেছি।

—ও খোকন। আয়। কার সঙ্গে এলি?

কারুকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, শুধু কথা শোনা যাচ্ছে।

দুজনে চলে এলো বৈঠকখানায়। খুব বড় বাড়ী, কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। একজন বয়স্কা মহিলা একতলায় একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আরে খোকাবাবু যে! এসো এসো সঙ্গে এটি কে?

অভিজিৎ বললেন, আমার বন্ধু সুজয়। বড় মাসীমা কেমন আছো তুমি?

অভিজিৎ সেই মাসীমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সুজয়ও প্রণাম করলো।

যদিও এটা অভিজিতের মামার বাড়ী, কিন্তু মামারা এখানে কেউ নেই। এক মামা বিলেতে আর এক মামা দিল্লীতে। এখানে থাকেন সুজয়ের দাদু আর দিদিমা। আর এই মহিলাটি দূর সম্পর্কের মাসী।

অভিজিৎকে সেই মাসী তাঁর ঘরে নিয়ে বসাতে চাইছিলেন, অভিজিৎ বললো, দাঁড়াও বড় মাসী, দাদুকে প্রণাম করে আসি। মাসীমা বললেন, দেখিস, সাবধান। কর্তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে।

সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো বারান্দায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই বারান্দার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, একজন বুড়োলোক। তাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুজয়। তার বুকের মধ্যে ছম্ ছম্ শব্দ হচ্ছে। জীবনে এমন অবাক সে কখনো হয় নি।

এই তো সেই লম্বা বড় বারান্দা। আর এই বুড়ো লোকটিকে তো সে কাল দেখতে পেয়েছিল বাথরুমে চোখ বুজে। ইনিই তো চাবি হারিয়ে গেছে বলে চ্যাঁচাচ্ছিলেন। অভিজিৎ বললো, কী হলো দাঁড়ালি কেন? উনি আমার দাদু।

সুজয় আর অভিজিৎ গিয়ে প্রণাম করলো তাঁকে। অভিজিৎ বললো, দাদু এ আমার বন্ধু সুজয়।

দাদু বললেন, তোর মা কেমন আছে? সে এলো না কেন? আজ আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে। আমার ছাবির গোছা হারিয়ে গেছে, সিন্দুকের চাবি, ট্রাঙ্কের চাবি, ব্যাঙ্কের লকারের চাবি সব একসঙ্গে ছিল।

সুজয়ের বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে এখনো। সে জানতো ঠিক মিলে যাবে, চাবির গোছা মিলে যাবেই। অভিজিতের দাদুর বুকের সব চুল পাকা।

অভিজিৎ বললো, কখন হারালো দাদু?

এই তো সকালবেলা। কী কাণ্ড দ্যাখ না নিশ্চয়ই কেউ বদ মতলবে লুকিয়ে রেখেছে। আমি বাড়ী ছেড়ে দু'দিন কোথাও যাই নি, চাবি কি করে হারাবে?

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অভিজিতের দিদিমা। তিনি বললেন, খোকন এসেছিস! দ্যাখ না কী কাণ্ড। চাবি হারিয়ে ফেলে তোর দাদুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দাদু বললো, হবে না? কেউ যদি ঐ চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে? সারাদিন ধরে পাহারা দিচ্ছি, ঘর থেকে একেবারেই বেরুই না। কিন্তু এরকমভাবে ক'দিন যাবে?

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, নতুন চাবি, করানো যায় না?

দাদু বললেন, কতকাল আগেকার চাবি, ও কি এখন পাওয়া যায়? ব্যাঙ্কে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে অনেক দামী জিনিসপত্র রয়েছে...।

দিদিমা বললেন, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা আর কী করবে তার। আয় তোরা ঘরে আয়। এই ছেলেটি কে? তোমার নাম কী?

সুজয় কথা বলতে গেল কিন্তু তার গলা দিয়ে যেন আওয়াজই বেরুচ্ছে না। অতিকষ্টে নিজের নামটা বলল।

দিদিমা ডাকলেন, রজত, রজত!

কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের একটি ফিটফাট চেহারার ছেলে এলো সেই ডাক শুনে।

দিদিমা বললেন, রজত, এদের জন্য মিষ্টি এনে দাও। ঠাকুরকে বলো মাংস রাঁধতে। ওরা আজ এখানে খাবে।

ছেলেটি চলে গেলে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, দিদিমা, ও কে? ওকে তো আগে দেখিনি?

দিদিমা বললেন, সেই যে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ওকে এনেছি। ও সম্পর্কে আমার কাকার ছেলে। লেখাপড়া বেশী শেখেনি, ও সবে একটা হোটেলের কাজ করছিল। তাই ওকে নিয়ে এসেছি আমাদের বাড়িতে থাকবে।

মিষ্টি আর জলটল খাবার পর সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ গেল ছাদে। মস্ত বড় ছাদ। বাড়ীর চারপাশটা ফাঁকা। আকাশে একটু জ্যোৎস্না। নারকোল গাছের পাতায় হাওয়ার সর সর শব্দ হচ্ছে।

—কী রে তুই কোনো কথা বলছিস না কেন? কী বলবো?

একেবারে গুম মেরে আছিস যে? তোর ভাল লাগছে না?—হ্যাঁ।

সুজয় তখনও ভাবছে, সে যে আজ এখানে আসবে, তার তো কোন ঠিক ছিল না আগে থেকে। তবু সে এই বাড়ীতে তার বন্ধুর দাদুর চাবি হারানো দৃশ্যটা দেখল কেন আগে থেকে। দেখেই বা কী লাভ হলো?

অভিজিৎ বললো, এই বাড়ীর পিছনের দিকটায় একটা বেশ বড় বাগান আছে। দেখতে যাবি।

সুজয় চমকে উঠে বললো, বাগান!

—হ্যাঁ। খুব চমৎকার বাগান। দাদুর খুব ফুল গাছের সখ। যাবি? —এক্ষুনি।

অভিজিৎ একটা টর্চ চেয়ে নিল দিদির কাছ থেকে। সুজয়ের আর ধৈর্য থাকছে না, সে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে বাগান দেখতে চায়।

ঠিক সেই বাগানটাই কিনা তা বুঝতে পারলো না সুজয়। অন্ধকারের মধ্যে সুজয় শুধু টর্চের আলোয় কয়েকটা গাছ দেখছিল। সেটা যে কোনো বাগান হতে পারে। তাছাড়া, বাগানে ছুরি হাতে একটা লোকের সঙ্গে অভিজিৎ-এর দাদুর সিন্দুকের চাবি হারাবার সম্পর্ক কি?

অভিজিৎ-এর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সুজয় প্রত্যেকটা ফুল গাছের ওপর আলো ফেলতে লাগলো। বেশীক্ষণ খুঁজতে হলো না। সুজয় দেখতে পেল, একটা গোলাপ গাছে ফুটে আছে তিনটে গোলাপ ফুল।

সাদা গোলাপ। কোন সন্দেহ নেই, কাল এই গোলাপ গাছটাকেই দেখছিল সুজয়।

অভিজিৎ-এর হাতে টর্চটা দিয়ে সে বললো, তুই একটু এগো, আমি জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিচ্ছি।

অভিজিৎ বললো, সামনেই একটা সুন্দর বেঞ্চ আছে, চল, ওখানে বসে বেঁধে নিবি।

—তুই বেঞ্চে গিয়ে বোস, আমি আসছি।

অভিজিৎ এক পা এগোতেই সুজয় বসে পড়লো গোলাপ গাছটার পাশে।

গোলাপ গাছ ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটা সব সুদ্ধু উঠে এলো মাটি থেকে।

সুজয় কখনো গাছের একটা পাতা পর্যন্ত ছেড়ে না। গাছকে কষ্ট দিতে তারও কষ্ট হয়। কিন্তু এই গোলাপ গাছটার শেকড় কাটা।

গাছটা তুলে ফেলে তার শেকড়ের কাছটার গর্তে হাত ঢোকাল সুজয়। সে যা ভেবেছিল তাই। সেখানে রয়েছে সুজয়ের দাদুর চাবির গোছা।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে একটা পায়ের শব্দ পেয়েই সুজয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। সে দেখতে পেল একটা সাদা কেডস্ জুতো। তারপর খাঁকি প্যান্ট। এই সেই রজত।

রজত সুজয়কে মারবার জন্য একটা হাত তুলেছিল, তার আগেই সুজয় চেঁচিয়ে উঠলো, অভিজিৎ অভিজিৎ! আমি চাবি খুঁজে পেয়েছি। রজত থমকে দাঁড়ালো। তারপরই পেছন ফিরে লাগালো দৌড়। এরপর রজতকে আর দেখতেই পাওয়া যায় নি।

অভিজিৎ কাছে এসে বললো, চাবি? দেখি, দেখি! সত্যিই তো। তুই কী করে পেলি?

সুজয় বললো, আমার পায়ে হোঁচট লাগলো। আমি দেখলাম, একটা চাবির গোছা—।

তারপর সুজয় মন দিয়ে গোলাপ গাছটাকে পুঁতে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। সত্যি কথা তো বলে লাভ নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না।

অলসের সংসর্গই কু-সংসর্গ

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সাতজনের তিনজন

হিমালয়ের খুব গহন অঞ্চলে দু'জন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একজন খুব রোগা, লম্বা আর শুকনো চেহারার বুড়ো; আর একজন বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান, কিন্তু তার মাথার চুলের মাঝখানে একটা গোল গর্ত। কেউ এক সময় তার মাথায় ঐ জায়গার চুল কেটে নিয়েছিল, সেখানে আর চুল গজায়নি।

হিমালয়ের এরকম জায়গায় কোনো মানুষজন দেখা যায় না। পর পর বিরাট বিরাট পাহাড়, যেন একেবারে আকাশচুম্বী, আর মাঝে মাঝে উপত্যকা। এছাড়া দারুণ গভীর সব খাদও আছে। পাহাড়ের চূড়াগুলোয় বরফ, কিন্তু মাঝামাঝি জায়গায় বেশ ঘন-জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যেই থাকে ঐ লোক দু'জন। ওদের বাড়ী-ঘর কিছু নেই, রাত্তিরবেলা গাছতলায় ঘুমোয় আর সারাদিন টো-টো করে ঘোরে।

এখানকার জঙ্গলে ফলমূল বিশেষ পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায়, তাও খাওয়া যায় না, এমন বিস্বাদ। তবে কিছু খরগোস আর হরিণ আছে। ওরা তাই মেরে খায়। বুড়ো লোকটির আর শিকার করার ক্ষমতা নেই, জোয়ানটির

কাঁধে ঝোলে ধনুক আর কয়েকটা তীরভর্তি তূনীর। এমনি জামা-কাপড়ও নেই ওদের, গাছের বাকল দিয়ে কোনোরকমে পোশাক বানিয়েছে।

পর পর দু'দিন ওরা কোনো শিকার খুঁজে পায়নি। পেট জ্বলছে খিদেয়। এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে এসে ওদের মনে হচ্ছে সব জন্তু-জানোয়ার বুঝি ওদের ভয়ে নিরুদ্দেশে চলে গেছে।

জোয়ানটি বললো, মামা, আর যে পারি না।

বুড়ো লোকটি বললো, ওরে আশু, আমিই কি আর পারিছি! কিন্তু উপায় তো নেই, বেঁচে থাকতে হবে, আর বাঁচতে হলে খাদ্যও খুঁজতে হবে।

আশু বললো, এই বন-জঙ্গল আর ভালো লাগে না। চলো, যেখানে মানুষজন আছে, সেখানে যাই।

মামা বললো, খবরদার না। ওকথা বলিস না! লোকজনরা যদি আমাদের চিনে ফেলে? তবে সর্বনাশ হবে!

আশু বললো, এতকাল পরেও আমাদের কে চিনবে? ওঃ, খিদেয় আমার পেট একেবারে পুড়ে যাচ্ছে চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

মামা চমকে উঠে বললেন, ওকি! এমন শব্দ করছিস কেন?

খিদে পেলে আমার অমন হয়।

না না, ছি! অমন করতে নেই। ছোটবেলায় তোর ঐ দোষ ছিল, অনেক কষ্টে সারিয়েছি।

চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ, মামা, আমি আর পারছি না, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

আরে ছি ছি ছি ছি, অমন করে না। চল্-চল্, খাদ্য খুঁজে দেখি।

আরও কিছুক্ষণ বনে বনে ঘুরলো ওরা। তারপর মামাই বেশি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো মাটিতে পড়ে-থাকা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়িটা নড়ে উঠল।

মামা উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ভাগ্নে আশু তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে ফেললো। মামা বলে উঠলো, ওরে বাপ রে, এটা কী রে?

সেটা আসলে একটা ময়াল সাপ। বনের শুকনো পাতায় তার মুখটা ঢাকা পড়ে আছে। এবার সে সড়াৎ করে মাথাটা ঘুরিয়ে আনলো এদিকে।

ভাগ্নে আর মামা দু'জনেই কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছে। মামা প্রথমে চমকে উঠেছিল, কিন্তু এখন আর মুখে বেশি ভয়ের চিহ্ন নেই।

ভাগ্নে ধনুকে তীর জুড়ে বললো, মামা, আজ এই সাপটাকে মেরে তারপর এটাকে পুড়িয়ে খাবে।

মামা বললো, আরে ছি ছি, রাম রাম! আমরা উচ্চ বংশের লোক, ব্রাহ্মণ, আমরা কখনো অসভ্য বুনো লোকদের মতন সাপ খেতে পারি?

ভাগ্নে বললো, এখানে কে আমাদের দেখতে যাচ্ছে।

মামা বললো, তা ছাড়া এই সাপটা কোনো শাপগ্রস্ত মুনি-ঋষি কিংবা বিশিষ্ট লোক কিনা তাই বা কে জানে। ওকে মেরে কাজ নেই।

এমন সময় সাপটা মুখ ঘুরিয়ে এনে মামার একখানা পা কামড়ে ধরলো।

মামা তাতে একটুও ভয় না পেয়ে হাসতে হাসতে বললো, ওরে, তাহলে এটা মুনি-ঋষি নয়, আসল সাপ!

ভাগ্নে তখন সাপটার মাথায় একটা ধারালো তীর ছুঁড়লো। সাপটা অমনি মামার পা ছেড়ে দিয়ে ছটফট করতে লাগলো যন্ত্রণায়।

ভাগ্নে সাপটাকে একেবারে মেরে ফেলবার জন্যে আর একটা তীর ছুঁড়তে যাচ্ছিল, মামা তাকে বাধা দিয়ে বললো, ওরে আশু, থাক থাক! আর মারবার দরকার নেই। আমরা সত্যিই তো আর সাপ খাবো না। চল।

সাপটা যে মামার পায়ে কামড়ে দিয়েছে, তাতেও মামার পায়ে একটু দাঁতও বসেনি, রক্তও বেরোয়নি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাগ্নেকে মামা টানতে টানতে নিয়ে গেল সেখান থেকে।

আরও প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুরে কিছুই না পেয়ে বিরক্ত আর ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা খাদের ধারে বসলো। তারপরই চমকে উঠলো একটা গাছের দিকে তাকিয়ে।

গাছটা উঠেছে খাদের ধার ঘেঁষে। গাছটা বেশ বড়, লম্বা ধরনের, সোজা উঠে গেছে। নিচে কোনো ডাল-পালা নেই, একেবারে ডগার কাছে দুটি মাত্র ডাল, তাতে কয়েকটি ফল ফলে আছে। গাছটাকে দেখতে অনেকটা ইউক্যালিপটাস গাছের মতন, আর ফলগুলো আমের মতন। এমন আশ্চর্য গাছ এই জঙ্গলে আর একটাও নেই।

মামা বলে উঠলো, আরে!

ভাগ্নে বললো, এতক্ষণে বাঁচলুম, এবার খিদে মেটাবো, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

মামা বললো, চুপ কর। এটা কি গাছ জানিস। বহু ভাগ্যে এই গাছ

দেখতে পাওয়া যায়। এর নাম মৃতসঞ্জীবনী, এ গাছের ফল খেলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে।

ভাগ্নে বললো, মরা মানুষের কথা আমরা জানি না। এই ফল খেলে পেট তো ভরবে। চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

মামা বললো, ছিঃ আশু, এমন আওয়াজ করে না। ফলগুলো কী করে পাড়া হবে, সেই কথা ভাব। ঐ একটা ফল খেলেই আমাদের পেট ভরে যাবে।

গাছটায় ওঠা অসম্ভব। নিচে কোনো ডালপালা নেই, গা-টা মসৃণ। ফলগুলো এমন পাকা যে দেখলেই লোভ হয়।

ভাগ্নে বললো, সে আমি ব্যবস্থা করছি।

সে অমনি ধনুকে তীর জুড়লো। তারপর একচোখ বন্ধ করে ছুঁড়ল তীর। ভাগ্নের হাতের টিপ বেশ ভালোই, তীরটা গিয়ে বিঁধলো একটা ফলে। কিন্তু ফল-সমেত তীর মাটিতে না পড়ে গিয়ে পড়লো খাদে।

ভাগ্নে বললো, এই রে!

মামা বললো, ইস, অমন দামী ফল তুই নষ্ট করলি?

তীর দিয়ে ফল পাড়ার সুবিধা হবে না। তাহলে কী করা যায়? গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে দু'জন ওপরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো।

ভাগ্নে বললো, মামা, এক কাজ করা যাক। তুমি আমার কাঁধের ওপর দাঁড়াও। তাহলে তুমি হাত পেয়ে যাবে।

মামা বললো, ওরে বাপরে, এই বুড়ো শরীর নিয়ে তা কি আমি পারবো?

ভাগ্নে বলল, তাহলে তোমার কাঁধে আমি উঠি?

মামা বলো, ওরে না না, তোর ভার আমি সইতে পারবো না। তার চেয়ে আমিই উঠছি বরং।

ভাগ্নে তখন হাঁটু গেড়ে বসলো, মামা তার দু'কাঁধে পা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ব্যাল্যান্স রাখবার জন্য মামা এক হাতে খামচে ধরলো ভাগ্নের মাথার চুল। তাতে চুলের মাঝখানের গর্তটাতেও হাত লেগে গেল।

ভাগ্নে বললো, উঁহুহু, ওখানে হাত দিও না। ওখানে হাত দিলে এখনো ব্যাথা লাগে।

তারপর ভাগ্নে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। মামা এক হাতে গাছটা ধরে অন্য হাত বাড়িয়ে দিল ওপরের দিকে। তাতেও ঠিক হাত পাওয়া যায় না।

মামা ডিঙি মেরে আর একটু উঁচু হবার চেষ্টা করতে তার আঙুলের ডগা ছুঁয়ে গেল একটা ফলকে। কিন্তু ধরা যায় না।

ভাগ্নে জিজ্ঞেস করলো, হয়েছে?

মামা বললো, আর একটু উঁচু।

ভাগ্নে আঙুলে ভর দিয়ে আর একটু উঁচু হলো। মামা তখন দু'হাত তুলে গাছের একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করলো কোনোক্রমে। ফলসুদ্ধ একটা ছোট ডাল ধরামাত্রই সেটা ভেঙে গেল মটাস করে, তাল সামলাতে না পেরে মামাও পড়ে গেল হুড়মুড়িয়ে।

ভাগ্নে চোখ কপালে তুলে দেখলো, একটা ফল দু'হাতে নিয়ে মামা পড়ে যাচ্ছে খাদের মধ্যে। ভাগ্নে হাত বাড়িয়েও কিছু করতে পারলো না।

সে খাদ যে কত গভীর তা চোখে দেখে বোঝা যায় না। নিচের দিকটা মিশমিশে অন্ধকার। ভাগ্নে হায় হায় করে উঠলো।

ফল খাওয়া তো হবেই না, সে তার মামাকেও হারালো। মামা যতই বুড়ো হোক, তবু তো একজন কথা বলার সঙ্গী ছিল। এখন তাকে একা থাকতে হবে।

সে কেঁদে চেঁচিয়ে উঠলো, মামা!

অমনি খাদের বহু নিচ থেকে খুব অস্পষ্ট গলায় উত্তর এলো, আশু...

ওরকম খাদে পড়ে গেলে কোনো মানুষ কিছুতেই বাঁচতে পারে না। কিন্তু মামা বেঁচে আছে।

ভাগ্নে আবার চ্যাঁচালো, মামা, তুমি কোথায়?

মামা সেইরকম বহুদূর থেকে উত্তর দিল, আমি এখানে। ওপরে ওঠার উপায় নেই, খাড়া পাহাড়।

ভাগ্নে বললো, আমিই বা নামবো কী করে?

মামা বলো, তুই নামতে পারবি না! বি-দা-য়! আ-র আ-মা-দে-র দে-খা হ-বে না।

ভাগ্নে বললো, মামা, আমি যে কোনো উপায়ে হোক তোমায় উদ্ধার করবো। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

খিদে-তেষ্টা ভুলে গিয়ে ভাগ্নে দৌড়োতে লাগলো উল্টো দিকে ফিরে। তার একটা কথা মনে পড়েছে। মামাকে উদ্ধার করার সেই একটা মাত্র উপায়ই আছে।

এখান থেকে তিনখানা পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে। অত দূরে তারা বহু বছর যায় নি। মামাই বারণ করতো সব সময়। ওখানে বিপক্ষ দলের একজন থাকে। এখন বাধ্য হয়েই তার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে হবে।

এক-একটা পাহাড় পেরিয়ে যেতে লাগলো ভাগ্নে। মাঝখানে একটা ঝর্নার জল খেয়ে পেট ভরিয়ে নিল। একসময় মাথার ওপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন যেতে দেখে সে লুকিয়ে পড়লো ঝোপের মধ্যে। সে এরোপ্লেনের শব্দে ভয় পায় না বটে, কিন্তু তাকে কেউ দেখে ফেলুক, এটা সে চায় না।

শেষ পর্যন্ত তিনখানা পাহাড় ডিঙিয়ে সে উপস্থিত হলো একটা উপত্যকায়। সেখানে একটা ঝর্নার পাশে গাছের ছায়ায় একটি ছোট্ট বাঁদর শুয়ে আছে।

ভালো করে দেখলে অবশ্য বোঝা যায়, সেটি বাঁদর নয়, হনুমান। মুখটা কালো, চার পায়ের হাতের পাঞ্জাও কালো, লেজটি বেশ লম্বা।

হনুমানটি ঘুমিয়ে ছিল। ভাগ্নে তার পাশে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে কাতর গলায় ডাকলো, প্রভু! প্রভু!

দু'তিনবার ডাকার পর হনুমানটি চোখ মেলে বললেন, আঃ! কে রে বিরক্ত করে?

হনুমানটি সত্যিই মানুষের মতন কথা বলতে পারেন। কারণ, ইনি যে-সে হনুমান নন, ইনি রামায়ণের সেই হনুমান। রামচন্দ্রের সেবক। এর তো মৃত্যু নেই, ইনি অমর, যতকাল পৃথিবী থাকবে, ততকাল ইনিও বেঁচে থাকবেন। আগে এঁর শরীরটা ছিল ইলাস্টিক, ইচ্ছে মতন বড় কিংবা ছোট করা যেত। বহুকাল কেটে গেছে বলে এঁর শরীরের কলকব্জায় মরচে পড়েছে, এখন আর শরীরটা বড় হয় না।

হনুমানের প্রশ্ন শুনে ভাগ্নে বললো, আজ্ঞে আমি দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা।

হনুমান বললেন, আমায় এখানে জ্বালাতে এসেছো কেন?

আজ্ঞে আমার বড় বিপদ।

তোমার বিপদ তাতে আমি কী করব? যাও যাও।

প্রভু, আমি বহু দূর থেকে এসেছি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

কী আপদ! এটা এখানে এত উৎকট শব্দ করে কেন? যা, যা!

প্রভু, আমার মামা খাদে পড়ে গেছেন। তাকে আপনি বাঁচান। ইয়ে, মানে বাঁচাতে হবে না, উদ্ধার—

তোমার মামা খাদে পড়েছেন, বেশ করেছেন। আমি তাকে উদ্ধার করতে যাবো কেন? তোমার মামাটা কে?

আমার মামার নাম কৃপ। একসময় ছিলে মহাবীর। কৌরব-পাণ্ডবদের পাঠশালায় অস্ত্র শিখিয়েছিলেন।

হুঁ! ভারী তো মহাবীর! কোন যুদ্ধটায় তিনি জিতেছেন শুনি? তাঁকে উদ্ধার করার কী দায় পড়েছে আমার?

প্রভু, আমরা তো মোট সাতজন আছি। আমরা যদি পরস্পরকে বিপদের সময় সাহায্য না করি, তাহলে কে করবে বলুন? এতদিন পরেও শত্রুতা মনে রাখতে আছে?

তা সাতজন যখন আছে, তখন অন্য কারুর কাছে যাও না। আমাকে বিরক্ত করছো কেন?

আর কার কাছে যাব বলুন? আমাদের মধ্যে বলি আছেন পাতালে। আর ব্যাসদেব সকলের ঠাকুরদা, অতি বুড়ো মানুষ, তাঁকে কি খাদে নামতে বলা যায়? তাছাড়া, শুনেছি তিনি থাকেন কাশীতে। বিভীষণ আছেন শ্রীলঙ্কায়। পরশুরাম দক্ষিণ সমুদ্রতীরে তপস্যা করতে চলে গেছেন, এদিকে আর আসেন না। রইলাম বাকি আমরা তিনজন। এখন আপনি যদি সাহায্য না করেন...

আমি এত বুড়ো হয়েছি, আমার গায়ে আর শক্তি নেই। নড়তে-চড়তেই পারি না, আমি যাবো খাদে নামতে!

অশ্বত্থামা এবার রেগে গিয়ে ধনুকে বাণ জুড়ে বললো, তবে রে ব্যাটা হনুমান, এত করে বলছি, তবু তুই যাবি না? তাহলে তোকে মেরেই শেষ করবো।

হনুমান চোখ পিটপিট করে একটু দেখলেন অশ্বত্থামাকে। তারপর হঠাৎ তাঁর লেজটা দিয়ে অশ্বত্থামার গলায় তিন পাক জড়িয়ে তাকে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিলেন।

আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে হনুমান বললেন, বুড়ো হয়েছি বলে কি গায়ে একটুও শক্তি নেই যে তোর মতন একটা চুনোপুঁটিকেও টিট করতে পারবো না?

লেজের পাকে বন্দী অবস্থায় অসহায়ভাবে অশ্বত্থামা হনুমানের স্তব করতে লাগলো। সে বললো, হে প্রভু, আপনাকে একটু উত্তেজিত করার জন্যই আমি মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিলাম। নইলে আপনাকে ভয় দেখাবো এমন সাধ্য কী

আমার। আপনি মহা শক্তিমান আপনি জন্মাবার পরই আকাশের সূর্যকে একটা ফল ভেবে একলাফে ধরতে গিয়েছিলেন, আপনি এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন, আপনার মতো মহাবীর আর কেউ নেই...।

প্রশংসা শুনে একটু খুশি হলেন হনুমান। তারপর অশ্বত্থামার গলায় তাঁর লেজের পাক একটু আলগা করে বললেন, হ্যাঁ, এক সময় ওসব করেছি বটে, কিন্তু এখন আর লাফ-ঝাঁপ দিতে ভালো লাগে না। মরণ নেই, তাই কোনোরকমে বেঁচে আছি।

অশ্বত্থামা বললো, কিন্তু আপনি ছাড়া কেউ পারবে না আমার মামাকে বাঁচাতে। আপনি লঙ্কা থেকে লাফিয়ে মন্দার পাহাড়ে গিয়েছিলেন, আর হিমালয়ের একটা খাদে লাফানো তো আপনার কাছে নস্যি। ছোট্ট একটা লাফ দিলেই হবে।

হনুমান জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সে পড়েছে?

অশ্বত্থামা হাত তুলে তিনটে পাহাড় দূরে জায়গাটা দেখালো। হনুমান বললেন, ওরে বাবা, অতদূর আমি হাঁটতেই পারবো না, হাঁটুতে দারুণ ব্যাথা।

আজ্ঞে, হাঁটতে হবে কেন? আপনি এক লাফেই তো পৌঁছে যেতে পারেন।

বুড়ো বয়সে যখন-তখন কেউ তিড়িং তিড়িং করে লাফায়? একবার লাফালে সেই ঢের। আমি যদি বা লাফিয়ে যাই, তুই যাবি কী করে?

আপনি যদি আমায় পিঠে করে নিয়ে যান।

লজ্জা করল না ঐ কথাটা বলতে? আমি বুড়ো মানুষ, তোর মতন একটা জোয়ানকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাবো? তুই যদি আমায় ঘাড়ে করে নিয়ে যাস, তাহলে যেতে পারি।

শেষ পর্যন্ত তাই করতে হলো, হনুমান কিছুতেই হেঁটে বা লাফিয়ে যেতে রাজি নয়। অশ্বত্থামা তাকে কাঁধে করে সেই তিনখানা পাহাড় ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পরদিন সকালে পৌঁছালো খাদটার কাছে।

অমররা কিছুতেই মরবে না, বেঁচে আছে ঠিকই, তবু জ্ঞান আছে কিনা জানবার জন্য অশ্বত্থামা ডাকলো, মামা—

খাদের তলা থেকে উত্তর এলো, আশু, আমায় এখান থেকে তোল, এখানে বড্ড পিঁপড়ে—

অশ্বত্থামা বললো, মামা, ভয় নেই, ব্যবস্থা হয়ে গেছে, হনুমানজী এসেছেন।

হনুমান ততক্ষণ দেখলেন গাছটাকে। বয়সের জন্য চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে, সব জিনিস ভালো দেখতে পান না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা মৃতসঞ্জীবনী গাছ না?

অশ্বত্থামা বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ, এই গাছটার ফল পাড়তে গিয়েই তো—

হনুমান অমনি একলাফে গাছটায় গেলেন।

কিন্তু কী কাণ্ড, হনুমান মোটে গাছটার আধখানা উঁচু পর্যন্ত উঠতে পারলেন, তারপরই পড়ে যাচ্ছিলেন।

হনুমান বললেন, ইস, দেখলি কী অবস্থা হয়েছে আমার। এইটুকুও লাফাতে পারি না। খাদ থেকে তোর মামাকে তুলবো কী করে?

অশ্বত্থামা নিরাশ হয়ে বললো, তাহলে কি হবে?

দেখছি কী ব্যবস্থা করা যায়।

হনুমান গাছটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, আর আস্তে আস্তে উঠতে লাগলেন গাছটা বেয়ে। নিজের জাতের এই পুরনো অভ্যেসটা তিনি এখনো ভোলেননি। ক্রমে একেবারে উঠে গেলেন গাছের ডগায়। একটা ফল ছিঁড়ে কামড়েই তিনি বললেন, আঃ, কী অপূর্ব স্বাদ!

অশ্বত্থামা লোভীর মতন বললো, প্রভু, আমায় একটা দিন। আপনি ছুঁড়ে দিন, আমি লুফে নেব।

হনুমান এক ধমক দিয়ে বললেন, দাঁড়া বাপু! আমি আগে পেট ভরে খেয়ে নিই। এক হাজার বচ্ছর কিছু খাইনি, শুধু রাম নাম জপ করে খিদে মিটিয়েছি।

এক এক করে সে গাছের সব ক'টা ফল ফলই খেয়ে ফেললেন তিনি। অমনি তাঁর শরীরটাও বড় হতে লাগল মৃতসঞ্জীবনী ফলের গুণে। তিনি বিশাল হয়ে গেলেন এবং এমন গর্জন করে উঠলেন যে সমস্ত বন কেঁপে উঠল।

তারপর লাফিয়ে নিচে নেমে অশ্বত্থামাকে নিজের এক বগলের মধ্যে চেপে ধরলেন।

অশ্বত্থামা বললো, এ কী, এ কী! আপনি আমায় একটাও ফল দিলেন না?

হনুমান বললেন, চল।

তারপর অশ্বত্থামাকে বগলে চেপে রেখেই তিনি এক লাফে চলে এলেন খাদের তলায়।

• সেখানটায় একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না। শব্দ শুনে কৃপ বললে, ওরে আশু, এসেছিস?

হনুমানকে পাওয়া গেছে, আর চিন্তা নেই। ঐ গাছের ফলগুলো যে কী সুন্দর, কী মিষ্টি, তোকে কী বললো। একটা ফল খেয়েই আমার গায়ে যেন অনেক জোর বেড়ে গেছে। হনুমান আমাদের ফলগুলো পেড়ে দেবে, নিশ্চয়ই দেবে, নিশ্চয়ই দেবে, তাই না হনুমান?

হনুমানের বগলের চাপে অশ্বত্থামার প্রায় দম আটকে আসার মতন অবস্থা। সে চিঁ চিঁ করে বললো, মামা, উনি সব ফলগুলো খেয়ে ফেলেছেন। চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

হনুমান বললেন, কী আপদ, এটা ঘোড়ার মতন ডাকে কেন? এটা মানুষ না ঘোড়া?

কৃপ বললো, আপনি জানেন না, জন্মাবার সময়ই ও ঘোড়ার মতন ডেকে উঠেছিল বলেই তো ওর নাম অশ্বত্থামা রাখা হয়েছিল। অনেকদিন এ রকম ডাকেনি, আবার শুরু করেছে। ও হনুমান, তুমি ফলগুলো সব খেয়ে ফেলেছো, অ্যাঁ?

হনুমান বললেন, বেশ করেছি।

অশ্বত্থামা বললো, ও হনুমানজী , প্রভু, ছেড়ে দিন, আমার লাগছে, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

হনুমান প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে বললেন, চোপ্!

তারপরেই তিনি কৃপকে উদ্দেশ্য করে পেল্লায় এক চড় কষালেন।

কৃপ বললো, এ কী।

হনুমান বললেন, এখন আমার সব মনে পড়ে গেছে। ভীম আমার সম্পর্কে ভাই হয়। সেই হিসেবে সব পাণ্ডবরাই আমার ভাই। তোমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলে। শুধু তাই নয়, পাঁচটা কচি কচি ছেলে তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন তাদের গলা টিপে মেরে ফেলেছিল এই পাষণ্ড অশ্বত্থামা। আর তুমি কৃপ, তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলে। আমার ভাইপোদের তোমরা মেরেছিলে, আজ আমিও তোমাদের গলা টিপে মেরে ফেলবো।

কৃপ বললো, ওসব পুরনো কথা আর এখন কেন মনে করছো ভাই? যা হবার তা তো হয়ে গেছে অনেক কাল আগে। তাছাড়া আমাদের কী মরণ আছে যে তুমি মারবে?

হনুমান বললেন, তাহলে তুমি এই খাদের মধ্যে অন্ধকার নরকে থাকো। আমি এর অন্য ব্যবস্থা করছি।

কৃপ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, ও হনুমান ভাই, আমাকে এখানে ফেলে যেও না। এখানে ভীষণ পিঁপড়ে, আমায় সর্বক্ষণ কামড়াচ্ছে।

নরকে এরকম পিঁপড়ে থাকে।

এই বলেই হনুমান 'হুপ' শব্দ করে এক লাফে উঠে এলেন খাদের ওপরে। তারপর সেখান থেকে আর এক লাফে চলে এলেন কাশ্মীরে। সেখানে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার একটা চূড়ায় এসে নেমে হনুমান অশ্বত্থামাকে বগল থেকে মুক্ত করলেন।

অশ্বত্থামা বললো, এ কোথায় এলাম, চিঁ-হিঁ...

হনুমান বললেন, তোকে খুব ভালো জায়গায় এনেছি।

আঙুল দিয়ে অনেক নিচের একটা উপত্যকা দেখিয়ে বললেন, ওখানে কী ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখছিস?

অশ্বত্থামা বললো, ঘোড়া মনে হচ্ছে।

হনুমান বললেন, হ্যাঁ, ওখানে একজাতের খুব ভালো ঘোড়া থাকে। কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত ওদের ধরতে পারেনি, কারণ ওখানে কেউ নামতে পারে না। আর যদি নামে, উঠতে পারে না। শিশু হত্যাকারী পশু, তুই চিরকাল ঐ ঘোড়াদের সঙ্গে থাকবি। ভীম তোর মাথার চুল কেটে মণি কেড়ে নিয়েছিল, তাতেও তোর শাস্তি হয় নি। আমি তোকে এই শাস্তি দিলাম।

অশ্বত্থামা বাধা দেবার আগেই হনুমান তার ঘাড় ধরে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিলেন যে সে ছিটকে পড়ে গিয়ে গড়াতে লাগলো। গড়াতে গড়াতে একেবারে সেই অনেক নিচের উপত্যকায় গিয়ে পড়লো। ওখান থেকে আর উঠতে পারবে না কোনোদিন।

সন্তুষ্ট মনে হনুমান 'জয় রাম' বলে এক লাফ দিয়ে আবার ফিরে এলেন হিমালয়ে, সেই ঝর্নাটার ধারে, তাঁর জায়গায়!

দক্ষিণের ঘর

শিমুলতলায় অনেক বড় বড় বাড়ী ফাঁকা আছে। তার মধ্যে একটা বাড়ী হচ্ছে দীঘাপাতিয়ার রাজাদের। ওই রাজার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে পুপলুর বাবার চেনা ছিল। তাই সেবারে পুপলুর বেড়াতে গেল শিমুলতলায়। রাজাদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে উঠলো সেই বাড়ীতে। একজন মালি থাকে সেখানে! সে একতলার দোতলার সবগুলো ঘর খুলে দিল। শুধু বললো, 'বাবু একতলায় দক্ষিণের ঘরটায় আপনারা যাবেন না। এ ঘরটা খারাপ।'

প্রথমেই শুনে পুপলুর অবাক লেগেছিল। 'খারাপ মানে কী?' ঘর আবার খারাপ হয় কী করে? মা-বাবা খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশতে বারণ করেন। কিন্তু খারাপ ঘর? একতলায় বিরাট উঠোন। সেই উঠোনের একপাশে সেই ঘরখানা। ভাঙা-টাঙা নয়। মস্ত বড় লোহার দরজা। তাতে ঝুলছে প্রকাণ্ড তালা।

দু'তিন্‌দিন থাকবার পর শিমুলতলায় অনেক কিছু দেখা হয়ে গেল। লাট্টু পাহাড়ে পুপলু উঠেছিল তিনবার। কিন্তু পুপ্‌লুর সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে করে ঐ

দক্ষিণের ঘরটা দেখতে। একদিন সে মালিকে বললো, 'মালিদাদা, ঐ ঘরটা আমাকে একটু দেখতে দাও না।'

মালি শিউরে উঠে বলে, 'ওরে বাবা! ও কথা বলতে নেই। ওটা খুব খারাপ ঘর। যে ঢোকে, সে আর বেরোয় না।'

পুপলু জিজ্ঞেস করলো, 'কেন? ওর ঘরে কি আছে?'

মালি বললো, 'ও বাবা? সে আমি বলতেই পারবো না?'

একদিন দুপুরবেলা পুপলু চুপি চুপি গেল সেই ঘরটার কাছে। ঘরের জানালাগুলোও ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার গায়ে কান দিয়ে রেখে তার মনে হলো, কেউ যেন সেই ঘরের মধ্যে বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। পুপ্‌লু তালাটা ধরে কয়েকবার নাড়াচাড়া করতেই ঘরের মধ্যেও যেন গুম্ গুম্ করে শব্দ হতে লাগলো।

পুপলু খানিকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

বিকেলবেলা মাকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'মা, একতলার দক্ষিণের ঘরটা খোলা হলো না কেন?'

মা বললো, 'বোধ হয় ঐ ঘরে রাজাদের নিজেদের জিনিষপত্র আছে!'

পুপলু বললো, 'তা হলে মালি কেন বললো, ওটা খারাপ ঘর?'

মা বললো, 'বোধহয় নোংরা হয়ে আছে—তাই।'

পুপলু বললো, 'মা, ঐ ঘরের মধ্যে কারা যেন আছে ফোস্ করে নিশ্বাস ফেলে।'

মা হেসে বললো ধ্যুৎ। ওর মধ্যে কে থাকবে আবার। কতদিন ধরে ঐ ঘর তালাবন্ধ। ওখানে কি কেউ থাকতে পারে?'

পরদিন পুপলু দুপুরবেলায় আবার গেল সেখানে। দরজায়। কান দিয়ে রইল! সেদিনও মনে হলো, ভেতরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে।

সেদিন পুপলু ভয় পেল না। তার দারুণ কৌতুহল হলো। সে ছুটে গিয়ে মালিকে বললো, মালিদাদা, ঐ ঘরে কে থাকে?'

মালি বললো, 'ওরে বাবা, ওসব কথা বলতে নেই। ওদিকে যেও না খোকাবাবু। ঐ ঘরের মেঝেতে সুড়ঙ্গ আছে।'

পুপলু বললো, 'তুমি তালাটা খুলে দাও না। আমি শুধু ভেতরটা একবার দেখবো।'

মালি বললো, 'ওর চাবি তো আমার কাছে নেই। সে তো আছে রাজাদের কাছে। রাজারা তিন বছর আসেন নি এখানে।'

কলকাতা থেকে জরুরি চিঠি পেয়ে এর দু'দিন পরেই পুপলুর বাবা কলকাতায় ফিরে এলেন সবাইকে নিয়ে।

এখন যদি কেউ পুপলুকে জিজ্ঞেস করে, শিমুলতলায় কেমন বেড়ালে পুপলু? সে চুপ করে থাকে। তার মন খারাপ লাগে। সেই দক্ষিণের ঘরটাই দেখা হলো না। কী আছে? পুপলু কোনদিন কি জানতে পারবে না?

"অন্তরে অনিষ্ট চিন্তা
মুখে আত্মীয়তা
তার চেয়ে ঢের ভালো
প্রকাশ্যে শত্রুতা"

—গোবিন্দ লাল

নাগ চৌধুরীদের বাগান বাড়ী

সুলতানপুরের নাগচৌধুরীরদের যে বাগানবাড়ী সে বাড়ীতে কিন্তু বাগান নেই। আমার বন্ধু অলোক ঐ বাড়ীর ছোটছেলে। ওরা থাকে ভবানীপুরের একটা ছোট্ট বাড়ীতে। একদিন কথায় কথায় অলোক বললো, জানিস ভাই, সুলতানপুরে আমাদের একটা বিরাট বাড়ী এমনি খালি পড়ে আছে। দূরও না।

সুলতানপুর কলকাতা থেকে মাত্র বাইশ মাইল দূর।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেন, একটা বড় বাড়ী খালি পড়ে আছে কেন?

অলোক বললো, ঐ বাড়ীটা বানিয়েছিল আমার বাবা। সরকারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। একদিন ডায়মণ্ডহারবার থেকে গাড়ি করে ফিরছিলেন, সুলতানপুরে গাড়িটা খারাপ হয়ে যায়। সেখানে তাকে দু'তিন ঘণ্টা থাকতে হয়। জায়গাটা তাঁর পছন্দ হয়। বাবার পকেটে সেদিন দেড়শো টাকা ছিল। তাই দিয়ে সেদিনই ঐ গ্রামে দেড় বিঘে জমি বায়না করে ফেললেন।

আমি অবাক হয়ে বললুম, মাত্র দেড়শো টাকায় দেড় বিঘে জমি? খুব সস্তা তো।

অলোক বললো, না, বায়না মানে অ্যাডভান্স। জমির দাম সাত হাজার টাকা। কয়েকদিন পরেই বাবা গিয়ে বাকি টাকাটা দিয়ে জমি কেনা পাকা করে ফেললেন। তারপর শুরু হলো বাড়ী বানানো। বাবা নিজেই তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, নিজেই তৈরী করলেন বাড়ীর প্ল্যান, তারপর মিস্তিরি টিস্তিরি ডেকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু করাতে লাগলেন। আট মাস বাদে সেই বাড়ী তৈরি হলো আমি তখন বেশ ছোট। কয়েকবার বাবার সঙ্গে সেই বাড়ী তৈরি দেখতে গিয়েছিলাম মনে আছে। যাই হোক, গৃহ প্রবেশের দিন ঠিক হলো এক রবিবারে। সবাই মিলে আমরা ভোরবেলা চলে যাবো। শনিবার দিন বাবা শিয়ালদার বাজার, গ্লোব নার্সারি আরও কত সব জায়গা ঘুরে ঘুরে অনেক রকম ফল আর ফুল গাছের চারা কিনে আনলেন। তাঁর বাড়ীতে বাগান করবেন, কিন্তু...

অলোক একটু চুপ করে যেতেই আমি দুঃখিত ভাবে বললুম, বুঝেছি ইস্।

অলোক বললো, হ্যাঁ ঠিক সেই শনিবার রাত্তিরেই বাবা হার্টফেল করে মারা গেলেন। বাবার এত সখের বাড়ী। কিন্তু সেখানে গিয়ে আর তাঁর থাকা হলো না।

অলোক আবার বললো, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর মা বললেন, কিছুতেই আমি ঐ সুলতানপুরের অপয়া বাড়ীতে যাব না। সুতরাং আমাদেরও যাওয়া হলো না।

"তারপর থেকে বাড়ীটা খালিই পড়ে রইলো?"

"প্রথম কিছুদিন একটা দারোয়ান রাখা হয়েছিল। বাবা তাঁর জমানো সব টাকা খরচ করে ফেললেন ঐ বাড়ীর জন্য। শুধু শুধু বাড়ীটা ফেলে রাখার তো কোনো মানে হয় না? আমরা চেষ্টা করলুম ভাড়া দিয়ে দিতে। কিন্তু এ রকম গ্রামের মধ্যে অত বড় বাড়ী ভাড়া কেউ নিতে চায় না। এক বছর পরে আমরা চেষ্টা করলুম বাড়ীটা বিক্রি করে দিতে। তাও বিক্রি হল না।

"এখন দারোয়ান আছে?"

না, তাও নেই। পরপর দু'তিনটে দারোয়ান পালিয়ে গেল। গ্রামের কিছু লোক রটিয়ে দিয়েছে ওটা ভূতুড়ে বাড়ী। লোকের ধারণা, আমার বাবার অতৃপ্ত আত্মা ভূত হয়ে এ বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়।

এই কথা শুনে আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলুম।

"বলিস কিরে অলোক! এমন কথা শুনেও তুই দেখতে যাস নি? তুই নিজে দু'তিন দিন ও বাড়ীতে থাকলেই তো বুঝতে পারতিস ভূত বলে সত্যিই কিছু আছে কিনা! তুই একদিনও গিয়ে থাকিস নি?"

"কী করবো ভাই, মায়ের বারণ। আমরা মাঝে মাঝে ঐ বাড়ীতে পিকনিক করতে গেছি। কিন্তু রাত্তিরে থাকা হয় নি।

"ভাই এরকম একটা বাড়ীতে রাত কাটাবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। আজকাল তো ভূতের বাড়ী পাওয়াই যায় না।

"না, ভাই, আমি তোকে একলা তো সেখানে যেতে দিতে পারি না। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু চোর-ডাকাতের তো ভয় আছে। তোকে একা পেয়ে কেউ এসে তোর গলা টিপে মেরে রেখে যাবে, তারপর লোকে বলবে ভূতে মেরেছে!"

"আর দু' একজনকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাই?"

"তা হলে মাকে বলে দেখতে পারি।"

এই ব্যাপারে অনেকেরই উৎসাহ থাকে। অন্য বন্ধুদের বলতেই তাদের মধ্যে সুজয় আর বরুণ আমার সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু মুস্কিল হল অলোকের মাকে নিয়ে। তিনি কিছুতেই আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিতে রাজি নন। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, তোমরা তিনজনে যাবে...তিন সংখ্যাটি অপয়া। আর কাউকে জোগাড় করো, চারজনে যাও।

তখন অলোক বললো, মা তা হলে আমি যাই প্লীজ, মা, আমাকে যেতে দাও। আমরা তো দিনের বেলা পিকনিক করতে গেছিই। মনে করো, এটা রাত্তির বেলা পিকনিক।

সবাই মিলে মাসীমাকে এমন চেপে ধরলুম যে উনি আর অমত করতে পারলেন না।

পরের শনিবারেই আমরা রওনা দিলুম বরুণের গাড়িতে। সত্যিই সুলতানপুর মোটেই বেশি দূর নয়। আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলুম সেখানে। জায়গাটা খুবই গ্রাম। নাগচৌধুরীদের বাগানবাড়ীটা দূর থেকেই দেখা যায়।

বাড়ীটার কাছে এসে আমরা অবাক! এরকম বাড়ী আগে কখনো দেখিনি। পুরো বাড়ীটাই গোল। যেন একটা মস্ত চওড়া গম্বুজ। অনেকটা আগেকার

দিনের দুর্গ-টুর্গ এরকম হতো। প্রচুর জানালা আর প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে একটা করে ঝুল বারান্দা।

অলোকের চোখ ছলছল করে উঠলো, এই বাড়ীটা ছিল বাবার স্বপ্ন। রিটায়ার করার পর প্রতিটি দিন এই বাড়ীটার জন্য পরিশ্রম করছেন। অথচ একটা দিনও থাকতে পারলেন না।

সেই গ্রামেই একজন লোকের কাছে বাড়ীটার একটা চাবি রাখা ছিল। যারা বাড়ীটা কিনবার জন্য আসে, তাদের দেখবার জন্য। আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সে ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমরাও বুঝি খদ্দের।

ভদ্রলোকের নাম গঙ্গারামবাবু। যথেষ্ট বুড়ো হয়ে গেলেও বেশ মজবুত চেহারা। অলোকের পরিচয় পেয়ে কপাল চাপড়ে বললেন, আহা রে, নাগচৌধুরী মশাই বড়ো ভালো লোক ছিলেন। হঠাৎ যে অমন করে চলে যাবে কে জানতো। অতৃপ্ত আত্মা ফিরে আসে, এখনো আসে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমরা বন্ধুরা চোখাচোখি করলুম।

বরুণ জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কখনো কিছু দেখেছেন নাকি?"

গঙ্গারাম বাবু দুহাত নেড়ে বললেন, "না, না, আমি কিছু দেখি নি। তবে লোকে বলে তাই শুনি। তা আপনারা খাওয়া-দাওয়া করবেন কোথায়? আমার বাড়ীতেই ব্যবস্থা করি?"

আমরা বললুম "তার কোনো দরকার নেই। আমরা রাত্তিরের মতন পাঁউরুটি, চীজ, স্যালামি আর কমলালেবু নিয়ে এসেছি, দু'ফ্লাস্ক ভর্তি কফি আছে। সুতরাং রাত্তিরে খাওয়ার কোনো চিন্তা নেই। সবে বিকেল চারটে। আমরা প্রথমে সারা বাড়ীটা ঘুরে দেখলুম প্ল্যানটা খুব চমৎকার। এক তলায় শুধু বসবার ঘর, খাওয়ার ঘর, রান্না ঘর এই সব। আর দোতলায় শোওয়ার ঘর।

অলোক বললো, "কোন ঘরটা কার জন্য, তাও বাবা ঠিক করে রেখেছিলেন। এই যে ঘরটা দিয়ে পেছনের খালটা দেখা যায়, এই ঘরটা ছিল আমার দাদার জন্য।"

সুজয় বললো, "তা হলে আমরা আজ এই ঘরেই রাত কাটাবো।"

যে বাড়ীটা কোনদিন কোন মানুষ থাকে নি, সে বাড়িতেও কিন্তু মেঝের ধুলোতে অনেক মানুষের পায়ের ছাপ। তার মানে বাইরের লোক এখানে প্রায়ই আসে। তারা গঙ্গারামবাবুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে আসে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে আসে।

বাড়ীটার চারপাশে অনেকখানি জায়গা। ভাল ইটের সারি দিয়ে ভাগ করা আছে। দেখলেই বোঝা যায়, এক-এক রকম গাছ লাগাবার জন্য এক-একটা জায়গা আলাদা করা ছিল। কিন্তু বাগান আর করা হয়নি। এখানে অনেক আগাছা জন্মে রয়েছে।

বাড়ীটার পেছনে, একটু দূরেই একটা খাল। আমরা সেই খালের ধার দিয়েও ঘুরে এলাম। এ গ্রামে দেখবার কিছুই নেই। কেন যে এই জায়গাটা অলোকের বাবার এত পছন্দ হয়েছিল, তা কে জানে। তবে বেশ শান্ত আর নিরিবিলি ভাব আছে একটা।

এ বাড়ীতে ইলেকট্রিক আলো নেই। সন্ধ্যের পর সারা গ্রামটাই প্রায় অন্ধকারে ডুবে গেল। আমরা প্রত্যেকেই টর্চ এনেছি বটে কিন্তু লণ্ঠন জাতীয় কিছু আনা হয় নি। মোম থাকলেও কোনো লাভ হতো না, কেননা দারুণ হাওয়া দিচ্ছে।

আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে গঙ্গারামবাবুর কাছ থেকে একটা হ্যারিকেন চেয়ে আনলুম। সারা রাত জাগতে গেলে তাস খেলে সময় কাটানোই সবচেয়ে সহজ উপায়।

যে ঘরটা অলোকের জন্য তৈরী হয়েছিল, সেই ঘরেই বসলুম আমরা।

বরুণ জিজ্ঞেস করলো, "দরজাটা খোলা থাকবে, না বন্ধ করে দেবো?"

আমরা সবাই অবাক হয়ে বরুণের দিকে তাকালুম।

অলোক জিজ্ঞাসা করলো, "এই গরমের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রাখবো কেন? তুই কি এর মধ্যেই ভয় পেয়ে গেলি নাকি?"

বরুণ বললো, "দ্যাখ ভাই, আমি সোজাসুজি একটা কথা বলছি। আমি ভূতের ভয় পাই না, তাছাড়া ভূতেরা তো শুনেছি দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও ভেতরে আসতে পারে। কিন্তু আমার চোর-ডাকাতের ভয় আছে।

সুজয় বললে, "আমরা চার চারজন স্বাস্থ্যবান ছেলে রয়েছি। আর ডাকাত এলেই বা আমাদের কাছে দামী জিনিস কী পাবে?"

বরুণ বললো, "আমি দামি ক্যামেরা এনেছি, ভূতের ছবি তুলবো বলে।"

আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

অলোক বললো, "তুই ক্যামেরা এনেছিস আগে বলিস নি তো। আমাদের একটাও ছবি তুললি না? এখন আমাদের একটা ছবি তোল!"

বরুণ বললো, "তোদের ছবি তুলে আমি ফিল্ম বাজে খরচ করতে চাই না। তোদের সঙ্গে তো এসেছিই এ জন্য। ভূতের একটা ছবি যদি তুলতে পারি। তা হলে বিশ্বের প্রথম ভূত ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করবো।"

আমরা আবার হেসে উঠলুম। সুজয় বললো, "'ভূত ফটোগ্রাফার তার মানে কিন্তু দু'রকম হয়।"

সুজয়ের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ দড়াম করে একটা বেশ জোরে শব্দ হলো।

আমরা সবাই থেমে গিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালুম।

তারপর অলোক বললো, "পাশের ঘরের জানালার পাল্লাটা বোধহয় খোলা আছে।"

আমি বললুম, "কিংবা কেউ ধাক্কা মেরে খুলে দিল?"

অলোক বললো, "শোনো সবাই, আগে থেকে কয়েকটা জিনিস ঠিক করে নেওয়া যাক। প্রথমে বলোতো, আমাদের মধ্যে কেউ কি সত্যি সত্যি ভূতে বিশ্বাস করে? আমি একদম করি না। যে বিশ্বাস করে, সে হাত তোলো।

আমরা কেউ হাত তুললুম না। শুধু সুজয় বললো, "আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু ভূতের ভয় পাই।"

"তার মানে?"

"আমি মনে মনে জানি, ভূত বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু অন্ধকারে একা একা কোথাও যেতে আমার গা ছম ছম করে। এই যদি তোরা এখন বলিস, পাশের ঘরের জানালাটা কেমন করে খুলেগেল তা আমাকে একলা গিয়েদেখে আসতে, সেটা আমি পারবো না।"

বরুণ বললো, "আমি কিন্তু তা পারি। দেখে আসবো?"

অলোক বললো, "না আগে কয়েকটা জিনিস ঠিক করে নেওয়া যাক। আমরা এখানে রাত্তিরে থাকছি জেনে, গ্রামের কোনো দুষ্টু লোক আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করতে পারে। ফাঁকা বাড়ীতে এমনিই দরজা-জানালার কিছু

কিছু শব্দ হয়। রাত্তির বেলা যে কোনো শব্দই বেশি বেশি শোনায়। ঠিক কি না? এ রকম কিছু হলে আমরা দু'জন দু'জন করে টর্চ নিয়ে দেখতে যাবো। যে কোনো আওয়াজ হলেই আমরা দেখে আসবো সেটা কিসের আওয়াজ? সবাই রাজী?"

বরুণ বললো, "হ্যাঁ, এটাই ভালো!"

অলোক বললে, "আর একটা কথা। আমাদের নিজেদের মধ্যে কেউ যেন বদমাইশি করে অন্য কাউকে ভয় দেখাবার চেষ্টা না করে।

কথাটা বলেই অলোক আমার দিকে তাকালো। আমি হেসে ফেললুম। অলোক আমার মনে কথাটা বুঝে ফেলেছে ঠিক। আমার একটু ইচ্চে হয়েছিল সুজয়কে ভয় দেখানো।

বরুণ বললো, "তা হলে পাশের ঘরে আওয়াজটা কী জন্য হলো তা দেখে আসা যাক। আমার সঙ্গে কে যাবে?"

সঙ্গে সঙ্গে আবার দু'বার আওয়াজ হলো পাশের ঘরে। ঠিক মনে হয়, কে যেন একটা জানালা ঠেলছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "আমি যাচ্ছি বরুণের সঙ্গে।"

এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার আমরা কলকাতায় দেখতে পাইনা। লোডশেডিং-এর মধ্যেও প্রত্যেক বাড়ীতে একটু একটু আলো থাকে। এখানে অন্ধকার যেন দেওয়ালের মতন, টর্চের আলো তার মধ্যে কেটে কেটে বসছে। আকাশটাও মেঘলা, জ্যোৎস্নাও নেই।

পাশের ঘরের দরজাটা খোলা। আমরা দুজনে টর্চ নিয়ে দরজার কাছ থেকে ভেতরটা ভাল করে দেখলুম। জানালাটা ভালো করে দেখলুম। জানালাটা যে ঠেলে খুলেছে, তাকেও দেখতে পাওয়া গেল। একখানা বেশ বড় সাইডের হুলো বেড়াল।

বেড়াল বাবাজী কটমট করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। কিংবা, টর্চের আলো পড়লে বেড়ালের চোখ এমনিতেই জ্বলজ্বল করে।

আমি বরুণকে বললুম, ছবি তোল। ছবি তোল। ক্যামেরা আনিস নি? বরুণ বললো, বেড়ালের ছবি তুলবো?

—হ্যাঁ, এটা আসল বেড়াল কি না কে জানে। ভূতেরা অনেক রকম ছদ্মবেশ ধরতে পারে। এটা যদি—

আমি কথা শেষ করার আগে বেড়ালটা একটা লাফ মারলো।

ভয় পেয়ে দু'জনেই আমরা হুড়মুড়িয়ে পেরিয়ে এলুম দরজা থেকে। পাশের ঘর থেকে অলোক জিজ্ঞেস করলো, কী হলো?

বেড়ালটা অবশ্য আমাদের দিকে লাফ মারে নি। সে একেবারে অলিম্পিক স্পোর্টসম্যানদের কায়দায় এক লাফে খোলা জানালা দিয়ে চলে গেল বাইরে।

বরুণ বললো, বেড়াল আমার বিচ্ছিরি লাগে। ভূতের চেয়েও আমি বেড়ালদের বেশী ভয় পাই।

আমি অবশ্য বেড়ালদের অতটা অপচ্ছন্দ করি না, ভয়ও পাই না। কিন্তু রাত্তিরবেলা বেড়াল এসে বার বার জানালায় আওয়াজ করবে, সেটাও তো ঠিক নয়। সুতরাং ঘরের মধ্যে ঢুকে জানালাটা বন্ধ করে দিলুম ভালো করে।

আমাদের ঘরে ফিরে আসতেই আলোক জিজ্ঞেস করলো, কী ছিল রে? বেড়াল?

আমি বললুম, ঠিক ধরেছিস তো?

অলোক বললো, বেড়াল যখন আসে, তখন এ বাড়িতে ইঁদুরও আছে নিশ্চয়ই।

সুজয় সঙ্গে সঙ্গে পা গুটিয়ে বললো, এই রে, ইঁদুর?

আমি বললুম, এ ঘরটা তো বেশ পরিষ্কার। এ ঘরে ইঁদুর নেই। একটু বেশি রাত হলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেই হবে।

বরুণ বললো, দিনের আলো থাকতে থাকতে আমাদের দেখে নেওয়া উচিত ছিল, সব কটা ঘরের দরজা-জানালা আছে কিনা।

অলোক বললো, এখন দেখে আসছি। আমার সঙ্গে চল তো।

বরুণ বললো, দোতলার সিঁড়ির মুখে যে দরজাটা আছে, সেটা বন্ধ করে দিস।

একটু বাদে অলোক আর সুজয় ফিরে এসে বললো, একটু মুস্কিল রয়েই গেল। সবই কাঁচের জানালা তো। এর মধ্যে দুটো ঘরের দুটো জানালার কাচ ভাঙা। সেখান থেকে আবার বেড়াল ঢুকে আসতে পারে।

সুজয় শুকনো মুখে বললো, ইঁদুরও আসতে পারে।

অলোক বললে, তোরা কি পুরুষ মানুষ? ইঁদুর বেড়াল, এই ভাবে ভয় পাস? ইঁদুর বেড়াল কি মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

—ধ্যাৎ! চুপ কর তো।

এবারে আমরা কফি আর স্যাণ্ডউইচ খাওয়ায় মন দিলুম। কোনো কাজ না থাকলে বেশি খিদে পায়। চটপট আমাদের সব খাবারই শেষ হয়ে গেল।

আমি বললুম, এই যে রুটির টুকরো-ফুকরো রইলো, এগুলো বাইরে ফেলে দেওয়া দরকার। খাবারের গন্ধ পেলেই ইঁদুর আসবে। সুজয় ব্যস্ত হয়ে বললো, আমি ফেলে দিচ্ছি। আমি ফেলে দিচ্ছি।

খুব যত্ন করে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে ওসব টুকরোগুলো তুলে একটা জানালা খুলে ফেলে দিল বাইরে।

তারপর আমরা কিছুক্ষণ মন দিলুম তাস খেলায়।

হঠাৎ দরজার বাইরে চিক চিক শব্দ পাওয়া গেল।

সুজয় ভয়ে ভয়ে গুটিশুটি হয়ে গিয়ে বললো, এই রে ইঁদুর।

আমি বললুম, ইঁদুর নয় ছুঁচো। ইঁদুর কখনো এরকম ভাবে ডাকে না।

সুজয় বললো, ইঁদুর আর ছুঁচো একই হলো।

বরুণ বললো, মোটেই এক নয়। ইঁদুরের চেয়ে ছুঁচো বেশি কামড়ায়।

অলোক বললো, উঃ, তোদের নিয়ে আর পারি না। ইঁদুর ছুঁচো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস। আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

অলোক উঠে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে হুস, হ্যাট, হ্যাট বলতে লাগলো। আমি গিয়ে দাঁড়ালুম ওর পাশে। চিক চিক শব্দ শোনা গেলেও কোনো ছুঁচোকে দেখা গেল না।

একটু দূরে একটা ঘরের দরজায় আওয়াজ হলো দড়াম করে।

অলোক বললো, সব কটা দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছে।

—চল, দিয়ে আসি।

আমার আর অলোকের বেড়াল কিংবা ছুঁচো ইঁদুরের ভয় নেই। টর্চ জ্বেলে আমরা সবকটা দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিতে গেলুম। কিন্তু একটা দরজা বন্ধ করার উপায় নেই। সেই দরজার হুড়কোটা ভেঙে পড়ে আছে নিচে। যাই হোক। দরজাটা টাইট করে চেপে বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

হঠাৎ যেন মনে হলো, একটা ঠাণ্ডা হাত আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো চটাস করে।

আমি আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠলুম।

অলোক চমকে উঠে বললো, কী হলো?

আমি ভয়ে কোনো কথা বলতে পারছি না। সেই ঠাণ্ডা হাতটা যেন আমার গলা টিপে দিচ্ছে।

অলোক আমার দিকে টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে বললো, তোর কী হলো রে, সুনীল? ওমা এটা কী? এঃ! একটা টিকিটিকি পড়েছে দেখছি তোর ঘাড়ে।

আমার মনে হলো, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। টিকটিকি দেখলে আমার এমন ঘেন্না হয় যে কী বলবো। আর সেই একটা টিকটিকি আমারই ঘাড়ের ওপর পড়েছে।

আমার মুখ দিয়ে বিকট আওয়াজ বেরুতে লাগলো।

অলোক বাঁ হাত বাড়িয়ে টিকটিকিকে এক ঝটকায় ফেলে দিল আমার ঘাড় থেকে। তারপর হো হো করে হাসতে লাগলো।

আমার এমন গা ঘিন ঘিন করছে, তক্ষুনি চান করে ফেলি। আমি কোন কথাই বলতে পারছি না।

অলোক হাসতে হাসতে বললো, খুব বীরপুরুষ দেখছি তুই। একটা টিকটিকি গায়ে পড়তেই একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা। তুই আবার চাইছিলি একলা এই বাড়ীতে এসে রাত কাটাতে?

অতিকষ্টে সামলে নিয়ে আমি বললুম, আমি ভূত-পেত্নী, সাপ, বাঘকেও ভয় পাই না, কিন্তু কাছাকাছি টিকটিকি দেখলেই আমার এমন গা গুলোয়—।

অলোক আমার পিঠে চাপড় মেরে বললো, বোঝা গেল, কার কত সাহস বোঝা গেছে। চল্।

ফিরে এসে দেখি সুজয় আর বরুণ জবুথবু হয়ে বসে আছে।

বরুণ বললো, তোরা চলে গেলি, আর অমনি একটা বেড়াল ঢোকবার চেষ্টা করছিল এই ঘরে।

অলোক বললো, যাঃ, বেড়াল কী করে আসবে; সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।

বরুণ বললো, আমি স্পষ্ট ম্যাও ম্যাও ডাক শুনতে পেলুম।

সুজয় বললো, আমি অবশ্য বেড়লের ডাক শুনিনি। বরুণ বললো, হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

সুজয় বললো, বেড়ালের ডাক কোথায়? ও তো ছুঁচোর ডাক।

বরুণ বললো, ছুঁচো খাবার জন্য বেড়াল এসেছিল।

আমি বললুম, বেড়াল তো ছুঁচো খায় না। বেড়াল ইঁদুর খায়।

বরুণ বললো, বেড়াল ইঁদুর খেতে পারে, আর ছুঁচো খাবে না কেন? তোকে কে বলেছে।

আমি বললুম, ছুঁচোর গায়ে যে বিচ্ছিরি গন্ধ। তাই বেড়াল পছন্দ করে না।

অলোক বললো, তোরা কী বাজে তর্ক শুরু করেছিস বল তো; নে, তাস খেলবি তো বোস। এখন রাত্তির মোটে নটা। এখনো কত রাত বাকি।

আবার কিছুক্ষণ আমরা মন দিয়ে তাস খেললুম। তারপর আবার একটা অসুবিধে দেখা দিল। হ্যারিকেনের শিখাটা দপ দপ করতে লাগলো। এক্ষুনি বোধহয় নিভে যাবে।

অলোক বললো, এই রে, কেরোসিন বোধহয় কম ছিল। আলো না থাকলে তাস খেলবো কী করে?

তারপরেই অলোক আর্তচিৎকার করে উঠলো, ওরে বাবা রে, এটা কী?

মুখ তুলে তাকিয়ে প্রথমে আমার মনে হোলো, একটা লিকলিকে কালো হাত সাঁ করে ঢুকে এলো ঘরের মধ্যে। তারপর সেই হাতটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো ঘরের মধ্যে।

অলোক দারুণ ভয় পেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

সুজয় হো-হো করে হেসে উঠে বললো, আরে এতেই ভয় পেয়ে গেলি? এ তো একটা বাদুড়।

ব্যাপারটা আমরা বুঝে গেছি। সত্যি একটা বাদুড় হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েছে। বাদুড় চোখে ভালো দেখতে পায় না, তাই বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।

বরুণ বললো, বাদুড় দেখে ভয় পাবার কী আছে? ও আপনি এক্ষুণি চলে যাবে।

অলোক মাটি থেকে মাথাই তুলছে না। কড়া গলায় বললো, বাদুড়। বাদুড় অতি সাংঘাতিক। একটু ছোঁয়া লাগলেই ঘা হয়ে যায়।

আমি বললুম, যাঃ, বাজে কথা। কিছু হয় না। আমি কত বাদুড় দেখেছি আগে।

বাদুড়টা ঘুরতে ঘুরতে একবার অলোকের মাথার খুব কাছে এসেই বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

অলোকের মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আমি তার পিঠ চাপড়ে বললুম, বোঝা গেছে। কতবড় বীরপুরুষ বোঝা গেছে।

অলোক এক লাফে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, বাদুড় ঢুকলো কী করে? আমরা সব ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়েছি। ওটা সত্যি সত্যিই বাদুড় তো।

সুজয় বললো, ভ্যামপায়ার হতে পারে।

বরুণ হো-হো করে হেসে উঠে বললো, হয় বাদুড়টা আগেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বসেছিল, কিংবা ছাদের দরজা খোলা আছে। সেখান দিয়ে এসেছে।

—বাদুড় কখনো বাড়ীর মধ্যে আসে?

—এসেছে তো দেখেছি।

সুজয় বললো, সে যাই হোক, দরজাটা বন্ধ থাক। আবার কখন বেড়াল কিংবা ছুঁচো ঢুকে পড়বে।

তারপর দরজা বন্ধ করেই বসে রইলুম। তাস খেলা বেশিক্ষণ জমলো না। ঘুম পেয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত সবাই ঘুমিয়ে পড়লুম শতরঞ্জি ওপর।

ভোরে প্রথম আলো চোখে পড়তে প্রথম ঘুম ভাঙল আমার। চোখ মেলেই বেশ অবাক হয়ে গেলুম। সারারাত এমনি এমনিই কেটে গেল, আর কিছুই ঘটলো না? অন্যরাও জেগে উঠলো একে একে।

বরুণ বললো, যাঃ! ভূতের ছবি তোলা হলো না।

অলোক বললো, আমরা চারজনেই বেড়াল কিংবা ছুঁচো কিংবা টিকটিকি কিংবা বাদুড় দেখে ভয় পেয়েছি। কিন্তু কেউ-ই ভূতের ভয় পাইনি। এ বাড়ীতে যে ভূত নেই, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অথচ এত বড় বাড়ীটা বিক্রিও হচ্ছে না, ভাড়াও হচ্ছে না। বাড়ীটা শুধু শুধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বরুণ বললো, চল ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে ভালো করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আসি। ওখানে ভাল জিলিপি আর কচুরি পাওয়া যায়।

ঘর থেকে বেরুতে গিয়েছি, এমন সময় অলোক বললো, এ কি?

দরজার সামনেই একটা লম্বা খাঁকি রঙের খাম পড়ে আছে। কাল রাত্তিরে আমরা কেউ সে খামটা দেখিনি।

অলোক খামটা তুলে নিল। খামের মুখ খোলা। তার মধ্যে একটা বাংলার টাইপ করা চিঠি।

তাতে লেখা আছে ঃ

মহাশয়,

এর আগে আপনাদের তিনটি চিঠি লিখেছি। উত্তর পাইনি অত্যন্ত জরুরি বিবেচনা করে এই চিঠির উত্তর দিবেন। এই অঞ্চলে একটি খুব বড় খাল কাটা হবে। সেই কাজের জন্য এই দিকে সেচ বিভাগের একটি অফিস বাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন। আপনাদের বাড়ীটি আমাদের পছন্দ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাদের বাড়ীটি ভাড়া নিতে চান; সত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ইতি—

চিঠি পড়ে অলোক হু-র-রে বলে লাফিয়ে উঠলো।

বরুণ জিজ্ঞেস করলো, পড়ে দ্যাখ। আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গভর্নমেন্ট থেকে ভাড়া নিলে আমরা টাকাও পাব, বাড়ীটা দেখাশুনা হবে। ভাগ্যিস আমরা এখানে এসেছিলুম। নইলে এ চিঠিটা আমাদের হাতে পৌঁছোতোই না।

কিন্তু কাল কতবার আমার এই দরজার সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছি, একবারও তো এই খামটা কেউ দেখতে পাই নি। এটা এখানে নিশ্চয়ই ছিল না তখন। এত ভোর বেলা খামটা এখানে কে ফেলে দিয়ে গেল?

কাল রাতে বেশ জোর হাওয়া দিচ্ছিল। অন্য কোনো জায়গা থেকে খামটা উড়ে এসে ঠিক এই দরজার সামনে পড়েছে? হয়তো তাই।

আলোর সিঁড়ি বেয়ে

আমি ছেলেবেলায় বীরভূমের একটা গ্রামের স্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল জুনিয়ার হাইস্কুল, মাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া যায়, তারপর অন্য স্কুলে যেতে হয়। অবশ্য ক্লাস থ্রি আর ফোর, এই দু'বছর শুধু পড়েছিলাম। সেই সময়কার কথা আমার সামান্য সামান্য মনে আছে।

একটা ঘটনা অবশ্য মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে আছে। কিছুতেই সেটা ভুলতে পারব না কখনো। এই সময় ক্লাস সেভেনের ছেলে প্রীতম হারিয়ে গিয়েছিল, সে নাকি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সবার চোখের সামনে।

আমাদের স্কুলটা ছিল গ্রাম থেকে একটু বাইরে, মাঠের মধ্যে। লম্বা একটানা একতলা বাড়ি, ওপরে টালির ছাদ। কাছেই একটি ছোট পুকুর। খুব সুন্দর দেখতে ছিল আমাদের স্কুলটা। শুধু গ্রীষ্মকালে এত গরম লাগত যে, গরমের ছুটি দেওয়া হত টানা আড়াই মাস।

সমস্ত মাষ্টার মশাইদের তো মনে নেই। একজনকে খুব মনে আছে। ওরকম চেহারার কোন স্কুল মাষ্টার আজকাল দেখাই যায় না।

তাঁর নাম ছিল তারানাথ বেদজ্ঞ। তিনি আমাদের সংস্কৃত আর বাংলা

পড়াতেন। আমরা তাঁকে স্যার না বলে বলতাম পণ্ডিত মশাই। তিনি পরতেন টকটকে লাল রঙের কাপড়, গায়ে কোন জামা নেই, ওই রকমই একটা লাল রঙের চাদর জড়ানো। আর তাঁর মাথায় চুলের বদলে ছিল একটা ময়াল সাপ!

সত্যি সত্যি সাপ তো নয়, জটা। কিন্তু ওরকম একটা অদ্ভুত জটা আমি আগে কখনো দেখিনি। ঠিক যেন একটা ময়াল সাপ কুণ্ডুলি পাকিয়ে রয়েছে মাথার ওপরে।

শুনেছিলাম পণ্ডিতমশাই একজন তান্ত্রিক। অবশ্য অত ছোট বেলায় তান্ত্রিক কথাটার কোন মানেই বুঝতাম না।

তবে পণ্ডিতমশাইকে দেখলে একটু ভয় ভয় করত। বেশ ফর্সা রঙ, লম্বা চওড়া চেহারা, গলার আওয়াজ খুব গমগমে। আমরা শুনেছিলাম পণ্ডিতমশাই এক কিল দিয়ে একটা নারকেল ফাঁটিয়ে দিতে পারেন।

ক্লাসে পণ্ডিত মশাই পড়ার বদলে গল্পই করতেন বেশি। নানারকম সব অদ্ভুত গল্প। তার মধ্যে ভূতের গল্পই ছিল তাঁর খুব প্রিয়। তার অধিকাংশ গল্পই আমার এখন মনে নেই।

একটা শুধু মনে আছে। একবার নাকি ভূত পণ্ডিত মশাইয়ের ডান পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরেছিল। সে গল্প শুনে আমরা ভয় পাবার বদলে হেসেছিলুম খুব।

আমাদের হাসতে দেখে পণ্ডিত মশাই টেবিলের উপর তাঁর ডান পাটা তুলে বলেছিলেন, এই দ্যাখ, আমার বুড়ো আঙুলটা অর্ধেক কাটা।

সত্যিই তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের কোনো নখ ছিল না। বুড়ো আঙুলটাই ছিল সবচেয়ে ছোট আঙুল।

প্রত্যেক গ্রামেই একটা করে শ্মশান থাকে। আমাদের বীরভূমের এই গ্রামেই শ্মশানটি ছিল খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মোটেই ভয়ের জায়গা নয়। অনেকে বিকেলবেলা বেড়াতে যেত সেখানে।

শ্মশানটা নদীর ধারে। সেখানে অনেকগুলো বড় বড় পাথর।

একটা পাথর অর্ধেক নদীর জলে ঝোঁকা। সেই পাথরটার ওপরে উঠে আমরা নদীর আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতুম। কোন কোন দিন দুপুরে নদীতে স্নান করতে এলে আমরা সেই পাথরটার ওপর থেকে ড্রাইভ দিতুম নদীতে।

অবশ্য বর্ষাকালে, কারণ সেই সময়ই নদীটা ভর্তি থাকত। অন্যসময় খুবই কম তিরতিরে জল, অনায়াসে হেঁটে পার হওয়া যায়।

শ্মশানের কাছে তো কয়েকটা বড় বড় গাছ থাকবেই। একটা বিশাল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বট গাছের নিচেই মড়া পোড়ানো হত। আরও দু'তিনটে গাছ ছিল। তার মধ্যে একটা বেশ লম্বা দেবদারু গাছ। এই দেবদারু গাছটা সম্পর্কে আগে দু একটা কথা বলা দররকার। সাধারণত হঠাৎ এরকম একটা দেবদারু গাছ দেখা যায় না। দেবদারু গাছ লোকে একসঙ্গে অনেকগুলো পোঁতে। কেউ না পুঁতলে এমনি এমনি দেবদারু গাছ হয় না। শ্মশানের কাছে ঐ দেবদারু গাছটা কে কবে পুঁতেছিল তা কারুর মনে নেই। বেশ বড়, লম্বা গাছ।

দেবদারু গাছ সম্পর্কে আরও একটা কথা আছে। দেবদারু গাছ-দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু এই গাছ কোন কাজে লাগে না। অন্য সব গাছই মানুষের কিছু না কিছু কাজে লাগে, কিন্তু দেবদারু গাছের সেরকম কোন উপকারিতা নেই। এ গাছে ফুল দেখা যায় না। ফল কেউ খায় না, এমন কি এর কাঠ দিয়ে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বানানো যায় না এমন নরম। দেবদারু গাছের পাতা দিয়ে অনেক সময় প্যাণ্ডেল সাজানো হয়। সেও তো সৌন্দর্যের জন্য। সৌন্দর্যই এর একমাত্র সম্পদ। অনেকে বলে এ গাছ আসলে স্বর্গের গাছ, কোন রকমে এসে পড়েছে। সেই জন্যই দেবদারু নাম।

আমাদের গ্রামে সেই শ্মশানটা খুব সুন্দর বেড়াবার জায়গা হলেও রাত্তিরে আমরা কেউ যেতাম না অবশ্য। রাত্তির বেলা দূর থেকে চিতার আগুন দেখলেই কেমন যেমন গা ছমছম করে। ছোটবেলায় করত। এখন করে না।

আমাদের সেই পণ্ডিত মশাই রাত্তির বেলা সেই শ্মশানে গিয়ে নাকি সাধনা করতেন। প্রায়ই স্কুলে আসতেন না তিনি। অন্য কোন মাষ্টারমশাই না এলে স্কুল আগে আগে ছুটি হলে আমরা আনন্দে হৈ-হৈ করে মাঠে খেলতে যেতাম। কিন্তু পণ্ডিত মশাই না এলে আমাদের একটু খারাপই লাগত।

একদিন স্কুলে গিয়ে শুনলাম, পণ্ডিত মশাইকে শ্মশানের কাছে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাঁর তখন জ্ঞান ফেরেনি। তাঁর নাকি সারা গায়ে বড় বড় আঁচড়ের দাগ।

সেদিন এমন গণ্ডগোল হলো যে, স্কুলে আর কোন পড়াই হলো না। আমাদের পণ্ডিত মশাইকে ভূতে আঁচড় দিয়েছে, আর আমরা কি সেদিন পড়াশুনা করতে পারি?

আমাদের স্কুলে সবচেয়ে দুরন্ত ছেলে ছিল প্রীতম আর গণেশ। কতরকম দুষ্টুমী যে ওরা করতো তার ঠিক নেই। হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে অনেক বার ওরা মার খেয়েছে। কনফাইন্‌ড হয়েছে। তবু ওদের শিক্ষা হয় না। অন্যদের তুলনায় ওরা ছিল বয়সেও একটু বড়। দু'তিন বার ফেল করেছিল কিনা। গণেশ একবার অঙ্কের ক্লাসে স্যারের সামনে একটা সাপ ছেড়ে দেয়। অঙ্কের স্যার তো সেই সাপ দেখে এমন ভয় পেয়ে গেলেন যে চেয়ার ছেড়ে পালাতে গিয়ে চেয়ার সমেত উল্টে পড়ে গিয়ে তাঁর মাথা কেটে গেল।

গণেশ অবশ্য বলেছিল, ওটা হেলে সাপ, ওর বিষ থাকে না। সাপটা ওর পোষা। হঠাৎ পকেট থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। প্রমাণ দেখাবার জন্য প্রীতম সাপটাকে নিজের হাতে ধরে গণেশের পকেটে ভরে দিয়েছিল। সেবার হেডমাস্টার মশাই ওদের স্কুল থেকে তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন। অন্যান্য মাস্টার মশাইরা বললেন, শেষবারের মতন ওদের চান্স দিতে। কারণ, প্রীতম আর গণেশ দু'জনেই খুব ভালো ফুটবল খেলে। ওরা চলে গেলে আমাদের স্কুলের টিম পাশের গ্রামের স্কুলের টিমের সঙ্গে নির্ঘাত হেরে যাবে। তাই প্রীতম আর গণেশকে লাস্ট চান্স দেওয়া হয়েছিল।

পণ্ডিত মশাই অজ্ঞান হবার দিনে সেই প্রীতম আর গণেশ কিন্তু ভূতটুতের কথা কিছু বিশ্বাস করেনি। ওরা বলেছিল, ভূতে আঁচড়ে দিয়েছে না ছাই। এমনি ভয় পেয়ে পণ্ডিত মশাই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর শেয়ালে কিংবা বেড়ালে ওঁকে আঁচড়ে দিয়েছে। প্রীতম আর গণেশ ডাকাবুকো ছেলে। ওরা কিছুতেই ভয় পায় না।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দুপুরবেলাই শ্মশানটার দিকে তাকিয়ে আমাদের গা ছম্ ছম্ করেছিল। অন্যদিনের মতন একই রকম শ্মশানটা। কিন্তু তবু যেন মনে হয় বেশি ফাঁকা ফাঁকা। হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ছে, সেটাও যেন কেমন ভয়ের ব্যাপার।

তিনদিন পর পণ্ডিতমশাই সুস্থ হয়ে আবার স্কুলে এলেন। সপ্তাহে দু'দিন মোটে তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন। আমরা অধীর হয়ে রইলুম, কবে তিনি আমাদের ক্লাসে আসবেন।

পণ্ডিত মশাই যেদিন এলেন, সেদিন খুব গম্ভীর। প্রথমেই বই খুলে তিনি আমাদের পড়াতে শুরু করে দিলেন ব্যাকরণ। আমরা ভেবেছিলুম, তিনি

দারুণ একটা গল্প বলবেন আমাদের। সেই গল্পের বদলে কী আর ব্যাকরণে মন বসে?

একজন ছেলে জিজ্ঞেস করলো, স্যার আপনি কি ভূতের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন?

পণ্ডিত মশাই গম্ভীরভাবে বললেন, না। আমি ভূত দেখিনি আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। তারপর আর কিছু মনে নেই। ব্যাস আর ওসব কথা নয়, অনেকদিন পড়াশুনো হয়নি, মন দিয়ে পড়ো।

আমরা খুব নিরাশ হয়েছিলুম একথা শুনে।

তারপর আবার কয়েকদিন স্কুল ঠিকঠাক চললো।

প্রীতম আর একদিন ওদের ক্লাসে কী একটা দুষ্টুমি করায় ওদের অঙ্কের স্যার বললেন, খুব তো তোদের সাহস! পণ্ডিত মশাইয়ের মতন রাত্তিতে শ্মশানে থাকতে পারবি?

প্রীতম উঠে বলেছিল, নিশ্চয়ই পারবো, স্যার।

—থাক দেখি একদিন।

—আমি একা থাকবো, না গণেশও আমার সঙ্গে যাবে?

—দুজনেই থেকে আয় তোরা! দেখি কত সাহস।

—কিন্তু স্যার আপনি কি করে বুঝবেন। আমরা সত্যি সত্যি শ্মশানে সারারাত থেকেছি? কী প্রমাণ চান?

—কোন প্রমাণ চাই না। তোদের মুখের কথাই যথেষ্ট।

—মুখের কথা বিশ্বাস করবেন?

—হ্যাঁ।

ভূত আছে কিনা দেখার জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে শ্মশানে যাবার অনেক গল্পই শোনা যায়। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কেউ ভয় পায়, কেউ ভয় পায় না। অনেক সময় অন্য লোক ভূত সেজে ভয় দেখায়। কিন্তু প্রীতমদের বেলায় ব্যাপারটা অদ্ভুত হলো।

মাঝরাত্তিতে গণেশ চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো গ্রামে। সে শুধু পাগলের মতন চিৎকার করছে, কিছুই কথা বোঝা যাচ্ছে না।

প্রীতম বা গণেশের বাবাও জানতেন না যে ওরা রাত্তিরে চুপি চুপি শ্মশানে গেছে। তারা অবাক হয়ে বেরিয়ে এলেন, গ্রামের আরও লোক জেগে উঠলো।

আমি অবশ্য ঘুমিয়েই ছিলাম। পরদিন সকালে অন্যদের মুখে শুনেছি সব ঘটনা।

অনেকক্ষণ জিজ্ঞেস করার পর গণেশ বলেছিল, প্রীতম কোথায় গেল? প্রীতম নেই।

তখন অনেকে মিলে লাঠি সোঁটা আর আলো নিয়ে ছুটে গিয়েছিল শ্মশানে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও প্রীতমের আর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু তার চটি জোড়া পড়ে আছে দেবদারু গাছের পাশে।

গণেশ বললো, সে আর প্রীতম শ্মশানে এসে বসেছিলো রাত আটটার পর থেকে। বটগাছটার তলায়। বসে থাকতে থাকতে ওদের ঘুম এসে গিয়েছিল। ওরা কিছুই দেখেনি, ভূত তো দূরের কথা একটা শেয়াল পর্যন্ত না।

ঘুম তাড়াবার জন্য প্রীতম উঠে পায়চারি করছিল। ওদের দু'জনের হাতেই টর্চ। প্রীতম ঘুরছে আর গণেশ টর্চের আলো ফেলছে। ঘুরতে ঘুরতে প্রীতম এক সময় দেবদারু গাছটায় ভর দিয়ে দাঁড়ালো। তার ঠিক পরের মুহূর্তেই গণেশের চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়েগেল প্রীতম।

এরকম কখনো হয় না। ভূতের অনেক রকম কাণ্ডকারখানার কথা লোকে বলেছেন কিন্তু ভূত কখনো কখনো মানুষকে অদৃশ্য করে নিয়ে যায় এরকম কক্ষনো শোনা যায় নি।

সেই রাত্তিরে সবাই ভেবেছিল, প্রীতমই বোধ হয় গণেশকে ভয় দেখাবার জন্য চট করে কোথাও লুকিয়ে পড়ছে।

পরদিন সকালেও প্রীতমকে পাওয়া গেল না।

আশেপাশের সমস্ত গ্রামে লোক পাঠানো হয়েছিল। কেউ প্রীতমকে দেখেনি। থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল! প্রীতমকে আর পাওয়া যায়নি। এমনভাবে প্রীতমের বাড়ী ছেড়ে পালাবারও কোন কারণ নেই। সে কোথায় চলে যাবে? কেন চলে যাবে?

খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছিল প্রীতমের কথা। কিন্তু কেউ আর তার সন্ধান দিতে পারেনি।

সেদিনের পর থেকে কিন্তু গণেশ একদম পাল্টে যায়। প্রীতম তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। সেদিনের পর থেকে আর কোনো ভূতের উপদ্রবের কথাও শোনা যায়নি। প্রীতমের মা ও

বাবা কাঁদতে কাঁদতে প্রায়ই রাতে এসে বসে থাকতেন শ্মশানে। কিছুই দেখেননি তাঁরা।

ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ার পর আমি ঐ গ্রামের স্কুল ছেড়ে শহরে চলে আসি। প্রীতমের ব্যাপারটা রহস্যই রয়ে গেল। ওরকম একটি দুর্দান্ত ধরনের ছেলে অন্য কোথাও এতদিন একেবারে চুপচাপ লুকিয়ে থাকবে, তাও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। গণেশ আর কোনরকম দুরন্তপনা করে না। সে চুপচাপ থাকে, আর প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।

মাঝে মাঝে ছুটিতে আমি ঐ গ্রামে যেতাম। আস্তে আস্তে লোকে ভুলে যাচ্ছে প্রীতমের কথা। ভূতের ব্যাপারটা কেউ বিশ্বাস করেনি। সবাই ধরে নিয়েছে প্রীতম কোথাও হারিয়ে গেছে।

আমিও স্কুল ছেড়ে কলেজে এলাম। ভূত ফুত আর একদম বিশ্বাস করি না। রাত্তিরবেলা শ্মশানে যাওয়া আর কোন ব্যাপারই নয়। গ্রামে গেলে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে এমনই রাত্তিরে শ্মশানের কাছে নদীর ধারে বসে আড্ডা দিয়ে আসি। সেই বড় পাথরটার উপর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়।

আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তখন আর একটি আশ্চর্য খবর শুনলাম। আট বছর বাদে প্রীতম ফিরে এসেছে। তাও খুব অদ্ভুতভাবে। একদিন সকালে গ্রামের একজন চাষী দেখেছিল প্রীতমকে সেই দেবদারু গাছটার নিচে ঘুমিয়ে থাকতে। তার খালি গা, খালি পা শুধু একটা ধুতি পরা।

আমি খবর পেয়েছিলাম কলকাতায় বসে। সামনেই পরীক্ষা, তাই তখন গ্রামে যেতে পারিনি।

দেড়মাস বাদে গ্রামে গিয়ে দেখলাম প্রীতমকে।

সাধারণ মানুষের মতনই সে ঘোরাফেরা করে। প্রীতমের বাবার একটা কাপড়ের দোকান ছিল, সেখানেই সে বসছে। এতদিন সে কোথায় ছিল সে সম্পর্কে কিছু বলে না। অনেক লোক ভিড় করে দেখতে আসে তাকে।

আমাদের চেয়ে তিন ক্লাস উঁচুতে পড়তো প্রীতম। বয়সে ছয় সাত বছরের বড়। সুতরাং আমার তাকে প্রীতমদা বলতাম। এবারে গিয়ে ওকে দেখে মনে হলো ওর যেন বয়স তেমন বাড়ে নি। অনেকটা আমাদেরই সমান মনে হয়।

সকালবেলা দোকানে বেরুবার আগে আগে প্রীতমের বাড়ী গিয়ে ওকে ধরলাম।

জিজ্ঞেস করলাম প্রীতমদা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

প্রীতমদা একটু হেসে বললো, আমার কিছুই মনে নেই রে নীলু। প্রীতমদার মা বললেন, আরও অবাক কাণ্ড কী জানিস নীলু? ও যে ধুতিখানা পড়ে চলে গিয়েছিল, ঠিক সেই ধুতিখানা পরেই ফিরে এসেছে। আট বছর কেউ এক ধুতি পরে থাকতে পারে?

প্রীতমদা মানুষজন সবাইকে চিনতে পারছে। শুধু আট বছর কোথায় ছিল সে কথা মনে নেই। এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমার কৌতূহল বাড়তেই থাকে। কথাবার্তা শুনে মনে হয় এর মধ্যে প্রীতমদা লেখাপড়াও আর শেখেন নি। সেই ক্লাস সেভেনের বিদ্যেতেই আটকে আছেন।

—তুমি কি সাধু হয়ে গিয়েছিলে প্রীতমদা?

—কি জানি কিছুই তো মনে করতে পারি না।

—দেবদারু গাছতলায় ফিরে এলে কী করে?

—তাও জানি না। মনে হয় যেন ঐ গাছে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আবার ঐখানে জেগে উঠলাম।

তুমি ভূত বিশ্বাস করো, প্রীতমদা?

—ধ্যুৎ? ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি?

ঠিক সেই আট বছর আগের কথা।

গণেশ দুর্গাপুরে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। অনেকদিন এ গ্রামে আসে না। প্রীতমদা নাকি একবারও গণেশের কথা জিজ্ঞেস করে নি কারুকে।

সেবার আমি গ্রামে ছিলাম।

প্রীতমদাদের বাড়ী আমাদের বাড়ীর কাছেই। চতুর্থ দিন রাতে সে বাড়ী থেকে শোনা গেল চ্যাঁচামেচির আওয়াজ।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম সেখানে।

প্রীতমদার মা কাঁদছেন। প্রীতমদাকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা খেয়ে দেয়ে প্রীতমদা শুতে গিয়েছিল। মাঝে রাত্রে তাঁর মা এসে দেখলেন, বিছানা খালি।

বাড়ীর কাছাকাছি খুঁজে কোন লাভই হলো না।

তখন সকলেরই মনে হল একটা কথা। আমরা দশ বারো জন আলো নিয়ে দৌড়ে গেলাম শ্মশানের দিকে।

সেই দেবদারু গাছটার তলায় চুপ করে বসে আছে প্রীতমদা। চোখ দুটো উপরের দিকে। আমাদের দেখেও সে গ্রাহ্য করলো না।

প্রীতমদার বাবা ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই—এইই প্রীতম, এখানে বসে আছিস কেন?

প্রীতমদা একটু রুক্ষভাবে উত্তর দিল, তাতে কী হয়েছে? এখানে বসে থাকাটা কী দোষের?

প্রীতমদার বাবা কেঁদে ফেললেন। তাঁর ভয় হলো, প্রীতমদা বুঝি আমার চলে যাবে।

সবাই ডাকাডাকি করতে প্রীতমদা উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তভাবে বললো, চলো যাচ্ছি। তোমরা আমাকে এরকম ডিসটার্ব করো কেন?

বাড়ী ফিরে প্রীতমদা খুব রাগারাগি করতে লাগলো।

তার মাকে বললো, দ্যাখো, আমি বড়ো হয়েছি। আমি কি ইচ্ছেমতো চলাফেরা করতে পারবো না। আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যাবে? আমার জন্য তোমাদের কোন ভয় পাবার দরকার নেই।

আমি প্রীতমদার মাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, মাসীমা, আপনারা এরকম জোর করলে বোধ হয় উল্টো ফল হবে।

প্রীতমদা সাহসী মানুষ ও বোধ হয় দেখতে চায় দেবদারু গাছটার নিচে ওর সত্যিই কী হয়েছিল। আপনারা বাধা দিলে তার ফল খারাপ হতে পারে।

সেই থেকে প্রীতমদা মাঝে মাঝেই রাত্তির বেলা বিছানা ছেড়ে উঠে চলে যায় সেই দেবদারু গাছটার কাছে।

সারাদিন সে ঠিক থাকে। কাপড়ের দোকানে বসে কাপড় বিক্রি করে। লোকের সঙ্গে হেসে কথা বলে। রাত্তির বেলা সে কেন দেবদারু গাছটার কাছে যায় সে সম্পর্কে কারুর সঙ্গে সে আলোচনা করতে চায় না। গ্রাম ছেড়ে আসবার আগের দিন রাত্রে আমিও একটা কাণ্ড করেছিলুম। কারুকে কিছু না বলে মাঝ রাত্রে আমিও চুপি চুপি চলে গিয়েছিলুম শ্মশানের দিকে।

ভূত দেখা বা অন্য ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই। আমার ইচ্ছা ছিল প্রীতমদা কী করে ওখানে, সেটাই দেখা। আমার কেন যেন সন্দেহ হয়েছিল, ওখানে, মাঝরাত্রে অন্য কোন লোক এসে প্রীততমদার সঙ্গে দেখা করে।

আমি আগে থেকেই গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম নদীর ঘাটের সেই বড় পাথরটার আড়ালে। সেখান থেকে দেবদারু গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। প্রীতমদা এলো ঠিক রাত বারোটার সময়ে। হাতের টর্চ জ্বেলে চার পাশটা একবার দেখে নিয়ে তারপর গিয়ে বসলো ঠিক দেবদারু গাছটার নিচে।

কিছুক্ষণ বাদে গুণগুণ করে একটা গান শুরু করলো। এর আগে আমি কক্ষনো প্রীতমদাকে গান গাইতে শুনিনি।

অদ্ভুত সেই গানের সুর। কথা একটিও বোঝা যায় না ঠিক যেন সাপ খেলানো বাঁশীর মতন সুরটা দুলছে।

রাত্তিরবেলা একা একা এতদূর এসে একটা গাছতলায় বসে এরকম একটা গান গাইবার মানে কী?

আমার মনে হলো, ঐ গানটা বোধ হয় কোন সংকেত। ঐ গান শুনে কেউ আসবে। প্রীতমদা কোন চোর ডাকাত-দলের সঙ্গে মিশছে না তো? সেই সময় চারদিকের গ্রামে খুব ডাকাতের উৎপাতের কথা শুনছিলাম।

সাবধানাতার জন্যে আমি একটা ভোজালি গুঁজে এনেছিলাম কোমরে। বেশি লোকজন দেখলে চুপ করে লুকিয়ে থাকবো। একজন দুজন লোক যদি আসে তাহলে ভোজালি দেখিয়ে তাদের কাবু করা যেতে পারে।

একটু পরে প্রীতমদার গান থেকে গেল। তারপর সব চুপচাপ। এতই চুপ চাপ যে সামান্য শব্দ হলেই চমকে উঠতে হয়। এক এক সময় হাওয়ায় গাছের পাতার সর সর শব্দ হলেই মনে হয় বুঝি কেউ আসছে। কিন্তু কেউ আসে না।

অপেক্ষা করতে করতে আমার ঘুম পেয়ে যায়। এক সময় ভাবলুম যাক, আর দরকার নেই। এবার চলে যাওয়া যাক।

পরে আবার ভাবলুম, এসেছি যখন শেষ পর্যন্ত থাকবো। দেখাই যাক না, কী হয়!

তখন কত রাত জানি না। বসে বসে যখন মনে হচ্ছে আর কিছুই হবে না সেই সময় মাত্র দু'তিন মুহূর্তের জন্য একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল।

দেবদারু গাছটার মাথা থেকে একটা সরু সবুজ আলোর দেখা উঠতে লাগলো। আলোটা যেতে লাগলো আকাশের দিকে। আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, আলোটা উঠতে উঠতে কত উঁচুতে যে উঠে গেল তার ঠিক নেই। যেন ঠিক আকাশ ফুঁড়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর সেই আলোটা নিভে যেতেই, আকাশ থেকে আবার একটা ঐরকম সরু আলোর রেখা নেমে এসে মিশলো দেবদারু গাছটার চূড়ায়। সেই আলোর রেখাটি খুব সরু, তবু সেটা এমনই উজ্জ্বল যে তাতেই চারদিক একেবারে আলো হয়ে গেল।

এক পলকের জন্য আমি দেখতে পেলাম প্রীতমদা উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আইছে। ঠিক যেন নাচের মতন ভাব। মুখে একটা দারুণ খুশির হাসি।

তারপরই আলো নিভে গেল।

সব দিক আবার ঠিক আগের মতন অন্ধকার। কী ব্যাপারটা হলো, আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। তবে একথাও ঠিক এমন রহস্যময় আলো আমি কখনো দেখিনি।

তারপর টর্চ জ্বেলে দেখলাম, প্রীতমদা হাঁটতে শুরু করেছে বাড়ীর দিকে। তখন আর তাকে ডাকলুম না।

পরদিন সকাল গ্রাম থেকে চলে আসার আগে আমি দেখা করলুম প্রীতমদার সঙ্গে। প্রীতমদা তখন বাজারের দোকানে চলেছে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি জিজ্ঞেস করলুম, প্রীতমদা, ঐ আলোটা কিসের?

প্রীতমদা অবাক হয়ে বললো, আলো? কিসের আলো?

কাল রাতে যখন দেবদারু গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলে?

—তোর কি মাথা খারাপ হয়েগেছে নাকি?

বুঝলুম প্রীতমদা আমায় কিছু বলতে চায় না। হন হন ক'রে এগিয়ে চলে গেল। তখন আমি লক্ষ্য করলুম, প্রীতমদার চুলের রং কেমন যেন লালচে হয়ে গেছে, এরকম কি আগে ছিল?

অথবা সকালের রোদ লেগে চুলগুলো ঐ রকম দেখাচ্ছে। কাল রাতে আমি যা দেখেছিলুম, তাও কি আমার চোখের ভুল? হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখে পেলেছিলাম?

তারপর তো চলে এলুম কলকাতায়। দু'একজন বন্ধুকে বললুম সেই ঘটনাটা। কেউ বিশ্বাস করলো না। সবাই বললো ওটা আমার চোখেরই ভুল।

একজন শুধু বললো, 'সিক্রেট লাইফ অব প্ল্যান্টস' নামে একটা বই পড়েছি, তাতে বৈজ্ঞানিক লিখছেন যে গাছ এমন অনেক জিনিষ পারে যা মানুষ এখনো

পারেনি। কোন কোন গাছ নাকি অন্য গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু আলো পাঠাবার কথা তো শুনিনি।—তারপর আমি পড়াশুনায় ব্যস্ত রইলুম।

ছ'সাত মাস আর গ্রামের কোন খবর পাই নি, গ্রামে যাইওনি। একদিন হঠাৎ খবরের কাগজে আমাদের ঐ গ্রামটার নাম দেখলাম। ঐ গ্রাম থেকে প্রীতম নামে একটি ছেলে দ্বিতীয়বার নিরদ্দেশ হয়ে গেছে। দুবার ঠিক একইভাবে সে চলে যায়। রাত্রিবেলা শ্মশানের কাছে একটা দেবদারু গাছের নিচে তাকে শেষ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

খবরটা পড়েই আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। মনে পড়ে গেল সেই সরু আলোর রেখাটার কথা।

পরের দিনই গ্রামে গেলাম। সেখানে একেবারে হৈ-চৈ ব্যাপার। সকলের মুখেই ঐ এক কথা। প্রীতমদাকে দেখে কেউ একবারও বুঝতে পারেনি সে চলে যাবে। প্রীতমদার নাকি বিয়ের কথাও হচ্ছিল।

প্রীতমদার মা খুব কান্নাকাটি করছেন। তার ধারণা প্রীতমদা আর বেঁচে নেই।

অন্য সকলের কিন্তু ধারণা, প্রীতমদা আগের বার সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, এবারও নিশ্চয়ই সে সেইখানেই চলে গেছে। আবার কিছুদিন পরে ফিরে আসবে।

আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হল না। আমার বার বার মনে হতে লাগলো, দেবদারু গাছের মাথায় ঐ সরু আলোর সঙ্গে প্রীতমদার কোন সম্পর্ক আছে। সেদিন আমি দেখেছিলাম। প্রীতমদা ঠিক একটা বাচ্চা ছেলের মতন আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক যেন ঐ আলোর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চাইছেন।

আশ্চর্য, এবার ও দেবদারু গাছের নিচে পড়েছিল চটিজোড়া।